# বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি।

শ্রীমদ্ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখিত।

প্রকাশক—সমাজপতি ও বসু।

৪৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

INDIA OFFICE
23 JAN. 1909
LIBRARY.

মূল্য ।৵০ আনা।

MISCELLANEOUS—contd.

838 Upádhyáy (Srímad Brahmabándhav). বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি। [Vilát Yátrí Sannyásír Chithi. Letter of an ascetic starting for England.] pp. 78. Samájpati and Basu, 49, Cornwallis Street, Calcutta. 3.9.06. Dcr. 16mo. 1st. As. 6.

B
838

INDIA OFFICE
29 JAN. 1909
LIBRARY.

# ভূমিকা।

এই পুস্তিকায় যে কয়খানি চিঠি প্রকাশিত হইল তাহা আমি বিলাত হইতে বঙ্গবাসী পত্রে লিখিয়াছিলাম। শুনিয়াছি যে চিঠিগুলি সাধারণের ভাল লাগিয়াছিল। তাই ঐগুলিকে পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইতি।

তারিখ ২০শে শ্রাবণ ১৩১৩। } লেখক।

# বিলাত-যাত্রী

## সন্ন্যাসীর চিঠি।

( ১ )

আমি একজন ইংরেজি-পড়া সন্ন্যাসী। আজ কাল অনেকানেক সন্ন্যাসী বিলাতে গিয়ে শাস্ত্রের বুক্‌নি-মিশানো-বক্তৃতা কোরে খুব হাততালি খায়। আমারও এক দিন সখ হোলো যে বিলাতের হাততালি খাবো। কলিকাতা মুম্বই ও মান্দ্রাজের হাততালি খুব খেয়েছি—এখন দেখি একবার চম্পকবরণ হাতের হাততালি কেমন মিষ্টি। সন্ন্যাসীর মন—

যেমনি খেয়াল অমনি উঠা।

পাঠক—তোমরা বিলাতগামী সন্ন্যাসীর রূপ বোধ হয় কখনও দেখ নাই। সাধারণতঃ মাথা গোঁপ দাড়ি সব মুড়ানো—রেশমের পাগড়ি রেশমের আলখাল্লা—পায়ে বিলাতী বুট—হাতে ছড়ি মুখে চুরুট—সঙ্গে পোর্টম্যাণ্ট গ্ল্যাডষ্টন-ব্যাগ ষ্ট্র্যাপ-বাঁধা বিলাতী-কম্বল-জড়ানো বিছানা—গলায় টাকা-মোহর-ভরা কুরিয়ার ব্যাগ। আহা মরি—সেজেছে ভাল। আমিও ঐ রকম কতকটা ঢং ধরিলাম—কেবল পয়সার অভাবে রেশমটা জুটিল না। আর বুট চুরুট ছড়ি পোর্টম্যাণ্ট ইত্যাদি আমার সংসঙ্গ অনেক দিন ত্যাগ কোরেছে হায়রে—আমার কেবল ইংরেজি পড়াই সার। আমার ছিল—গায়ে একখানি বনাত ও হাতে একখানি কম্বল। বন্ধুবান্ধবেরা ধোরে কোরে একটা গোদ্ধড় মোটা গরম কাপড়ের আলখাল্লা কোরে দিয়েছিল। দিয়েছিল তাই বেঁচেছি—নহিলে বিলাতের ঠাণ্ডায় দফা রফা হোয়ে যেতো।

মুম্বইয়ে জাহাজে উঠিবার আগে ডাক্তারে পরীক্ষা করে—পেলেগ হোয়েছে কি না—আর সব বোঁচকা-বুচকি কলের ভিতর পূরে একরকম ঔষধ দিয়ে ধুয়ে দেয়। আমার জিনিস-পত্তর দেখিতে এলো—দেখে কিছুই নাই। একেবারে অবাক্। একটা ব্যাগ বা পুঁটুলিও নাই। শুধু হাতে বিলেত। ডাক্তার সাহেব একটু এদিক ওদিক চেয়ে একখানা পাস দিয়ে দিলে। আমি একেবারে নবাবের মত গিয়ে জাহাজে উঠিলাম। আর আমার সহযাত্রীদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। ধাক্কাধাকি ঠেলা-ঠেলি পুলীশের গুতো খুব চলিতে লাগিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম —কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। এ দুর্দ্দশা কেবল দেশী যাত্রীদের—শাদা-চামড়া দেবদেবীর নহে।

জাহাজে উঠে ভাবিতেছিলাম ভোজনের ব্যবস্থা কি কোরে করিব। মাছ মাংস রুচে না—আর সাহেবেরা তরকারি চর্ব্বি দিয়া রাঁধে। ঘৃত আমাদের নিকট অমৃত—তাহা কিন্তু কর্ত্তারা মুখে করিতে পারেন না—যেমন কপাল। জাহাজ ছাড়িবার সময় বড় গোলমাল। ছাড়িয়া দিলে দেখি যে কতকগুলি সিন্ধুদেশবাসী হিন্দু সওদাগর জাহাজে উঠিয়াছে। কেহ মল্টা ( Malta ) কেহ জিব্রলটার ( Gibraltar ) কেহ তুনিস ( Tunis ) যাইতেছে। সিন্ধীরা সর্ব্বত্র ব্যবসায় করিতে যায়। জাপান মার্কিণ ইউরোপ আফ্রিকা সকল স্থানেই ইহাদের দোকান আছে। ইহারা জাতিতে বণিক্ কিন্তু মাংস ও মদিরা খায়। সমুদ্রপারে যাইলে ইহারা জাতিচ্যুত হয় না। আমি সিন্ধুদেশে অনেক দিন ছিলাম তাই ইহাদের মধ্যে দুই এক জন আমাকে জানিত। খুব খাতির। সকাল বেলা চা ও হাতগড়া-রুটি—মধ্যাহ্নে ভাত ডাল তরকারি—অপরাহ্ণে চা ও রাত্রিতে রুটি তরকারি। ইহাদের সঙ্গে রাঁধুনি ও চাকর ছিল। সে খালাসিদের চুল্লীতে পাক করিয়া আনিত। বেশ আমোদ-প্রমোদে দিন

কাটিত। সমস্ত দিন তাস পাশা ও সঙ্গীত চলিত। তাহাদের মদিরাপানও সঙ্গে সঙ্গে ছিল। সিন্ধীরা সুরাপান করে অল্প স্বল্প। মাতাল বড় একটা হয় না। জাহাজে একদিন একজন সিন্ধী উপরোধের দায়ে একটু বেশী খেয়ে মাতাল হোয়ে পোড়েছিল। সকলে তাহাকে এত ধিক্কার দিলে যে সে বেচারী লজ্জায় মরে।

জাহাজে তিন জন বুয়র ছিল। তাহারা বন্দী হইয়া ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। মুক্ত হইয়া দেশে যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে একজন সেনাপতি ( Commandant )। ইনি বেশ ইংরেজি জানেন। বুয়র-যুদ্ধের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস ইংরেজিতে লিখিয়াছেন। সর্ব্বসমেত পঁচিশ ত্রিশ খানা মোটা মোটা খাতা। শীঘ্রই ইহা মুদ্রিত হবে। আমি ইহা অনেকটা পড়িয়াছি। যে জাহাজে ইনি বন্দী হইয়া ভারতে আনীত হন—তাহাতে ৫০০ পাঁচ শত বুয়র ছিল। ইনি বলেন যে সেই পাঁচ শতের মধ্যে কেবল ৬৪ জন যোদ্ধা আর বাকি লোক কখন যুদ্ধ করে নাই। এলোপাতাড়ি কুড়িয়ে বাড়িয়ে তাহাদিগকে ধরিয়া আনা হইয়াছিল। ইনি ডিওয়েটের বন্ধু। ডিওয়েট একজন কৃষক ( Farmer )। লেখা পড়া পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত। যুদ্ধের আগে কে জানিত যে একজন গৃহস্থ কৃষক জগন্মান্য বীর হইয়া উঠিবে। ডিওয়েটের প্রস্থান বিবরণ শুনিয়া ইনি হাসিয়া উঠিলেন। গরুমহিষদের সঙ্গে সঙ্গে ডিওয়েটের পলায়ন —ইহা কেবল কাল্পনিক। ডিওয়েট ইংরেজদের ঘেরাওকে কিছুই গ্রাহ্য করিত না। কোলেনসো ( Colenso ) এবং মডার নদীর ( Modder river ) যুদ্ধে বুয়রেরা ইংরেজদিগকে বেশ বুঝাইয়া দিয়াছিল যে চড়াও কোরে ফতে করা একেবারে অসাধ্য। তাই কীচনর জাল পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন কখন্ শীকার আসিয়া পড়ে। বোথা ইংরেজের Blockhouse অর্থাৎ জালের গাঁটের মতন ছোট ছোট কেল্লা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ

করিতে পারিতেন না। কিন্তু রসদের অভাবে বুয়রেরা বড় ঘাল হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজ সেনাদের রসদ লুট করিয়া তাহাদিগকে চালাইতে হইত। ইহাতেও তাহারা পেছপাও হয় নাই। কিন্তু যখন হাজার হাজার বুয়র-রমণী ও বালক ইংরেজের কারাগৃহে মরিতে লাগিল তখন তাহারা মায়াবশে ও নির্ব্বংশ হইবার ভয়ে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিল। এই ত আমার সহযাত্রী বুয়র সেনাপতির ইতিহাসের দুই একটি কথা। আমার একটি ছোট তামার লোটা ছিল। সেইটীর উপর এঁর খুব নজর পোড়েছিল। তাই আমি ঐ লোটাটি তাঁহাকে উপহাররূপে দিয়া ফেলিলাম। ভারি খুসি। কিন্তু লোটা বিনা আমার বড় দুর্দ্দশা হইতে লাগিল।

মুম্বই হইতে অদন ( Aden ) পর্য্যন্ত সমুদ্র কিছু বিক্ষুব্ধ ছিল। তাই আমি বড় পীড়িত (Sea-sick) হোয়েছিলাম। মনে হইতেছিল কি কুক্ষণে জাহাজে উঠিয়াছিলাম। অনেকেরই আমার মতন অবস্থা হোয়েছিল। কিন্তু অদনে আসিয়া সব সারিয়া গেল। অদন—লোহিত সাগরের ফটক। লোহিত সাগর অতি সুন্দর। দুই দিকে দুই ভূখণ্ডের উপকূল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। মধ্যে নীল পায়োধি। জল ও স্থল দুইই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া চোখের ক্লান্তি হয় না। যেতে যেতে আফ্রিকার উপকূলে একটা পাহাড় দেখা গেল—তাহার নাম জবল শয়তান অর্থাৎ শয়তানের পাহাড়। দুই একজন আরব-দেশীয় সওদাগর বলিল যে এখানে জিনেরা অর্থাৎ ভূতেরা রাত্রিতে বড় ধা-ধা লাগিয়ে দেয়। দেখা যায় যে দিব্য দীপালোকশোভিত জাহাজ বেগে ধাবিত হইতেছে। একেবারে যেন সত্যিকারের জাহাজের ঘাড়ে এসে পড়ো পড়ো হয়—নিশান ( Signal ) মানে না। যখন সকলে নিরাশ হয়—ঠোকর লেগে ডুবে যাবার ভয়ে আকুল হয়—তখন কোথায় বা

জাহাজ আর কোথায় বা আলোকমালা—সব একেবারে অদৃশ্য। আরব-সওদাগরের কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু নাবিকেরাও ঐ কথা বলিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে একজন লেখাপড়া জানা জাহাজি ইঞ্জিনিয়রও সাক্ষ্য দিলেন যে তিনি ঐরূপ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এর পরে আর কি বলিব।

অদনে খুব গরমি। কিন্তু যত জাহাজ উত্তরে উঠিতে লাগিল তত ঠাণ্ডা পড়িতে লাগিল। আমার শরীর তখন বেশ ভাল ছিল। আমি অনেক রাত্রি অবধি জাহাজের উপরিস্থ ছাদে ( Upper deck ) বসিয়া বসিয়া সমুদ্রের বাহার দেখিতাম। চাঁদ উঠিলে বড়ই শোভা হয়। রাত্রিতে একরকম মাছ দেখা যায়—সেই মাছের মুখ হইতে আলো (Phosphorus) বাহির হয়। ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে জাহাজের সঙ্গে ছোটে। দেখিলে বোধ হয় যেন সমুদ্র থেকে তুবড়ি বাজি উঠিতেছে। আমি ইহাদের নাম রাখিয়াছি পরী মাছ। উড়ন্ত মাছও দেখিলাম। তবে আর ওসব লিখিব না। সমুদ্র-যাত্রার বর্ণন চর্ব্বিত-চর্ব্বণ হোয়ে গেছে। থোড়-বড়ি-খাড়াকে খাড়া-বড়ি-থোড় বলিয়া আর কি হবে।

অল্পে অল্পে জাহাজ সুয়েজের ( Suez ) খালে প্রবেশ করিল। খালটি আমাদের কলিকাতার খালের অপেক্ষা কিছু চওড়া। দুই ধারে মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। মাঝে মাঝে বৃক্ষলতা-শোভিত ইষ্টিশাণ। খালটি প্রায় ৫০ ক্রোশ দীর্ঘ। এই মরুভূমির মধ্য দিয়া অত লম্বা খাল কাটা অতিমানুষিক ব্যাপার। খালের প্রারম্ভে সুয়েজ বন্দর আর শেষে সৈয়দ বন্দর।

সৈয়দ বন্দর ছাড়াইয়া ভূমধ্য সাগরে আসিয়া পড়িলাম। আমার আবার রাত্রিতে বাহিরে বোসে ঠাণ্ডা লাগিয়ে কোমরে খুব ব্যথা ধরেছিল। কতকটা উত্থান-শক্তি-রহিত হোতে হোয়েছিল। মেরেকেটে

এক এক বার জাহাজের উপর আসিতাম। সৈয়দ বন্দর থেকে তিন দিন কেবল জলরাশি। তার পরে সিসিলি দ্বীপ দেখা গেল। সিসিলির এট্না আগ্নেয় পর্ব্বত দেখিতে অতি ভীষণ। অম্বর-চুম্বিত শিখর-দেশ হইতে অবিরত দীপ্ত ধূমরাশি উদ্গীর্ণ হইতেছে। ধূসরকৃষ্ট জলদজাল কটিদেশকে জড়াইয়া রহিয়াছে।

আমাদের জাহাজখানি এক ইতালীয় কোম্পানীর। ইহার গম্যস্থান জেনোয়া (Genoa) সহর। ৫ই অক্টোবর মুম্বই ছাড়িয়াছিল। ১লা নভেম্বর নেপল্‌স্ সহরে আসিয়া পঁহুছিল। ইতালীয়েরা এই সহরকে নাপলী (Napoli) বলে। ইংরেজ বাহাদুর এই সুন্দর নামটীকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। নাপলী একটি ছবি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দূর থেকে ঠিক যেন চিত্রার্পিতারম্ভ বলিয়া বোধ হয়। আমার টিকিট জেনোয়া অবধি ছিল। তথায় শুনিলাম নাপলী হইতে রোম (ইহার ইতালীয় নাম রোমা) রেলে চারি ঘণ্টার রাস্তা রোমা দেখিবার বড় সখ হইল। জাহাজ হইতে নামিয়া পড়িলাম। ভয়ানক কোমরে ব্যথা নিয়ে অতি কষ্টে ইষ্টিশাণে গেলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কোরে ডাকগাড়িতে উঠিলাম। গাড়ি রোমে রাত্রি নয়টার সময় পঁহুছিবে শুনিয়া একটু ভাবনা হোলো। বিদেশ ভূঁই—কি জানি কিরকম। গাড়ি খুব বেগে চলিল। আগ্নেয় পর্ব্বত বিসুবিয়স অতি নিকটে। ইহারও মাথায় ধূমরাশি। বিস্ময়ের কথা যে ইহার পৃষ্ঠে ও তলদেশে বড় বড় বসতি আছে। কতবার ভস্মসাৎ হইয়াছে তবুও ভয় নাই। রাস্তার দুই দিকে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সুন্দর সুন্দর গ্রাম। সমস্ত দেশটি যেন একখানি বাগান। বাহিরে ত এই প্রকৃতির শোভা। আবার গাড়ীর ভিতরেও প্রকৃতির লীলা। আমার গাড়িতে এক যুবক ও এক যুবতী উঠিয়াছিল। যুবক একটু স্থির গম্ভীর কিন্তু নারীটি কিছু চঞ্চলা। এই

যুগল মুরতির হাব-ভাব ব্যবহার দেখিয়া আমি ত একেবারে আড়ষ্ট। যুবক মাঝে মাঝে যুবতীর মুখ রুমাল দিয়া মুছাইয়া দিতেছে—পাছে কয়লার কালিমা লাগে—কখনও বা সুরা ঢালিয়া উভয়ে পান করে—আর কত যে কথা কত যে ভঙ্গিমা—বর্ণনায় কুলাইয়া উঠা দায়। গাড়িভরা ভদ্রলোক। তাহারা ওরূপ আচরণ দেখে ভ্রূক্ষেপও করিল না—যেন ওটা সচরাচর হোয়ে থাকে। কিন্তু আমার প্রাণটা হাঁপ হাঁপ করিতেছিল। কেননা আমার মনে ধারণা হয়েছিল যে নারীটি বারাঙ্গনা নহে—কুলাঙ্গনা। সত্য সত্যই সে কুলাঙ্গনা। আমার ত দেখে শুনে চক্ষুস্থির। যাহা হউক এইরূপ অন্তঃপ্রকৃতির ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে দোদুল্যমান হইতেছি এমন সময় দুইটি ইতালীয় ভদ্রলোক গাড়িতে চড়িল। পরে জানা গেল যে তাহারা মামা-ভাগিনেয়। মামা অল্প ইংরেজি জানে—ভাগিনেয় বেশ জানে। মামা একজন যোদ্ধা। তাঁহার সঙ্গে একটি খোদিত লাঠি আছে। উহাতে তিনি যত যুদ্ধ করিয়াছেন সব উহাতে সংক্ষেপে বিবৃত আছে। আমার সহিত কথা আরম্ভ হইল। আমি ইতালী দেশের সাহিত্য ইতিহাস শিল্পকলা ও রাজনীতির বিষয় কিছু কিছু জানি। যখন এঁরা—পেলিকো (Pellico) কি প্রকার দেশের জন্য কারাকষ্ট সহিয়াছিলেন—আর কবি পেত্রার্কা লরার জন্য কি প্রকার কাঁদিয়াছিলেন—ও আরো আরো ইতালীদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা এই কম্বলমাত্র-সম্বল বাঙ্গালি সন্ন্যাসীর নিকট শুনিলেন—তখন তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। বাস্তবিক ইতালী দেশকে আমি বড় ভালবাসি। ইতালীর ভাষা অতি সুমিষ্ট। ইতালীর লোকেরা বড় সৌজন্যগুণ-সম্পন্ন। আমার ইতালীর বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও পক্ষপাতিতা দেখিয়া মামা ও ভাগিনেয় খুব আপ্যায়িত হইল। তাঁহারা রোমনিবাসী নহেন।

তাহাদের বড় ইচ্ছা যে আমি তাঁহাদের দেশে যাই। যাহা হউক আমার আর কিছু ভাবিতে হইল না। তারা আমাকে এক হোটেলে লইয়া গিয়া বাসা দিল। খরচটরচ আমার এক পয়সাও লাগিল না।

রোমের বিশেষ বিবরণ আগামী সপ্তাহে লিখিব। আমি ইংলণ্ডে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। (Oxford) উক্ষপারে আছি। হাততালি খাবার খুব যোগাড় হোয়েছে। আগামী সপ্তাহে আমি একটি বক্তৃতা দিব। বিষয়—হিন্দুর চিন্তাপ্রণালী ও পাশ্চাত্য বিদ্যা। সভাপতি হইবেন এখানকার সংস্কৃত অধ্যাপক ( Boden Professor of Sanskrit ) এ-এ-মগ্‌দানল এম-এ। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে একটা গোলমাল সুরু হোয়েছে যে হিন্দুদর্শনের বিষয় বলিবার জন্য একজন কে কলিকাতা হোতে এসেছে। ছেলেবেলা কলিকাতার রাস্তায় অনেক দুয়ো হাততালি খেয়েছি। তবে বাঙ্গালি আর ইংরেজি হাততালিতে অনেক ভেদ। দেখি কপালে কি আছে। বিলাতের অনেক কথা আছে। আজ এই পর্য্যন্ত। ইতি তারিখ ১৩ই নভেম্বর ১৯০২।

# বিলাত-যাত্রী

## সন্ন্যাসীর চিঠি।

( ২ )

প্রথম চিঠিতে রোমে আসা পর্য্যন্ত লিখেছি। এক হোটেলে রাত কাটিয়ে সকাল বেলা ট্রাম গাড়ী কোরে সহর দেখিতে বাহির হোলাম। খুব ঠাণ্ডা পোড়েছে আর পোড়া কোমরের ব্যথাও খুব চেগে উঠেছে। তবুও মোরে মোরে চলিলাম। সহরের কথা আর কি বলিব। দোকানগুলি এমনি সাজানো যেন এক একখানি ছবি। এত ফুলের দোকান যে দেখে বিস্মিত হোতে হয়। সৌন্দর্য্যকে প্রকৃতির আড়াল থেকে টেনে বাহির কোরে মাঝ মজলিসে বসাতে এরা বড়ই মজবুত। রোমনগর সাতটী পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। কোথাও উঁচুতে উঠিতে হয় কোথাও বা নীচে নামিতে হয়। রাস্তা-গুলি মাঝে মাঝে বড় বড় চকে (Square) এসে পোড়েছে। চক সকল বড় সুন্দর। চারি দিকে ভাল ভাল বাড়ী ও দোকান। মাঝখানে পাথরের মূর্ত্তি ও ফোয়ারা। ফোয়ারা দিয়ে অনর্গল স্বচ্ছ শীতল জলধারা পড়িতেছে। রোমে চারিটী বৃহৎ পয়োনালী ( aqueduct ) আছে। এই নালী সকল দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। দূরে এক উচ্চ পাহাড়ের ঝরণা হোতে ইহাদের ভিতর দিয়া সহরে জল আসে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ ও অনুপম প্রস্তরমূর্ত্তি সকলে রোমের পুরাতন কীর্ত্তি জীবন্তভাবে পরিরক্ষিত রহিয়াছে। এইরূপে সহর দেখিতে দেখিতে উধাও মনে চলেছি এমন সময়ে ট্রামের অধিনায়ক (conductor ) এসে

বলিল যে ট্রাম আর যাইবে না। নামিয়া দেখি যে এক প্রকাণ্ড দেবালয় বা গির্জ্জার সম্মুখে এসে পড়েছি। দলে দলে নর নারী বালক বৃদ্ধ ধনী দরিদ্র—কেহ বা বাহির হোয়ে আস্‌ছে কেহ বা ভিতরে যাচ্ছে। এই দেবালয় এত বড় যে ইহার মধ্যে ও প্রাঙ্গণে ষাট হাজার লোক ধরে। দেখিলে মনে হয় যে ইহা বিশ্বকর্ম্মা নিজ হাতে নির্ম্মাণ করেছেন। ভিতরে যাহা দেখিলাম তাহা আমার সাধ্য নয় বর্ণন করা। বর্ণনা করিতে যাওয়া কেবল চক্ষু কর্ণে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া। মণিমুক্তা প্রবালাদি নাই কিন্তু দেবালয়টি রজতশুভ্র মর্ম্মরের হাস্যকৌমুদীতে যেন বিধৌত হইয়া বিরাজ করিতেছে। কত শত সাধু সাধ্বী মহাজনের (Christian Saints) মূর্ত্তি ও চিত্র স্থানটীকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। ইতালী দেশে পাঁচ সাত শত বর্ষ আগে মহা মহা শিল্পী ও চিত্রকর জন্মিয়াছিলেন। এখনও ইতালীর শিল্প ও চিত্রণবিদ্যা জগতে অতুলনীয়। এই চিত্রকরেরা দেবালয়ের দেওয়ালে ভিতরে বাহিরে ছবি আঁকিতেন। জগতে যত চিত্র আছে তন্মধ্যে রাফেয়েল নামক এক দৈবশক্তি-সম্পন্ন চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত মাতৃমূর্ত্তি না কি সৌন্দর্য্যে ও ভাবুকতায় শ্রেষ্ঠ। কাস্থলিক (Catholic) খ্রীষ্টানেরা মাতৃমূর্ত্তির বড় ভক্ত। মাতা মেরী (Mary) বালক জীশুকে কোলে করিয়া দণ্ডায়মানা। ইহাকেই মাতৃমূর্ত্তি (Madonna) বলে।

চিত্রকর মায়ের মুখে এক অপূর্ব্ব করুণরস ঢালিয়া দিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে বলে যে মা আগেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র অকালে নিহত হইবেন। তাই সুতস্পর্শজনিত আনন্দ বিচ্ছেদ-বিষাদে সংমিশ্রিত। মিলনানন্দের ভাগীরথী যেন ভারি বিরহশোকের কালিন্দীর সহিত মিলিয়া মায়ের চোখের আর্দ্র করুণভাব গড়িয়াছে। এমন মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি অতি বিরল। আজকাল য়ুরোপের ছবি আঁকিবার ঢং বদলিয়া

গেছে। মঙ্গলভাবের লেশমাত্র নাই কেবল রূপের ছটা ঘটা। উপাস্য মূর্ত্তি সকলেরও এইরূপ দশা ঘটিয়াছে। অধিক সৌন্দর্য্যবিন্যাসে প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। তজ্জন্য প্রতিমার সৌন্দর্য্য একটু মঙ্গলভাবের দ্বারা চাপিয়া রাখিতে হয়। আমাদের দেশে এই ভক্তিতত্ত্ব বেশ জানা আছে। এখনও য়ুরোপে অনেক দেবালয়ে প্রতিমা সকল একেবারেই সুশ্রী নয়। আর ভক্ত বিশ্বাসী কাস্থলিক খ্রীষ্টানেরা প্রাণ গেলেও সেই সকল কুরূপ প্রতিমাগুলির পরিবর্ত্তে সুরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না। যাহা হউক রোমের এই সুবৃহৎ দেবালয়ে অদৃশ্য স্বর্গীয় ভাব সকল—ন্যায় দয়া শক্তি ক্ষমা আনন্দ প্রেম ধ্যান জ্ঞান ভক্তি সেবা—প্রস্তর-মূর্ত্তিতে ও চিত্রপটে যেন রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি যে দিন এই দেবালয়ে গিয়াছিলাম সে দিন কাস্থলিকদের শ্রাদ্ধপর্ব্ব। কাস্থ-লিকেরা মৃত স্বজনের আত্মার কল্যাণের জন্য যজন মন্ত্রপাঠ ও দান করে। পুরোহিতেরা যজমানের হইয়া যজন ও মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন। সে দিন তাই বিবিধবর্ণশোভিত যজনযোগ্য বসন পরিধান করিয়া তাঁহারা লাতিন ( Latin ) ভাষায় গম্ভীর স্বরে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন আর ধূপ ধূনায় বেদী গৃহ সকল আমোদিত। কাস্থলিকদের আচার পদ্ধতি অনেকটা হিন্দুদের সঙ্গে মিলে।

দেবালয়ের লাগাও পোপের ( Pope ) প্রাসাদ। পোপ কাস্থলিক খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্ম্মগুরু। ইংরেজি ভাষায় ইঁহাকে পোপ বলে কিন্তু ইতালীয় ভাষায় পাপা অর্থাৎ পিতা বা বাবা বলে। ধর্ম্ম বিষয়ে পোপের বিধি বা শাসনকে সমগ্র কাস্থলিকমণ্ডলী ( সংখ্যা বিশ কোটী হবে ) একান্ত মান্য বলিয়া স্বীকার করে। পোপের সঙ্গে আর ইতালীর রাজার সঙ্গে এখন ঘোর বিবাদ। রোম ও তৎপার্শ্বস্থ কতকটা প্রদেশ পুরাকালের নৃপতিরা দেবোত্তর করিয়া গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান রাজার

পিতামহ এই দেবোত্তর সম্পত্তি—যাহা পোপেদের সম্পূর্ণ অধীনে ছিল—কাড়িয়া লন। পোপের কেবল প্রাসাদ ও দেবালয়টী আছে। রোম এখন রাজার। পোপ এই জন্য ইতালীর রাজাকে ধর্ম্মমণ্ডলী-চ্যুত করিয়াছেন। নৃপতির প্রাসাদটি আগে পোপেদের ছিল। এই প্রাসাদ এখন অভিশপ্ত ও পতিত। ইহাতে কোন পুরোহিত যজনক্রিয়া করেন না। রাজমহিষী বা রাজপুত্রেরা মণ্ডলীচ্যুত নহেন। তাঁহাদের ও রাজকুটুম্বদের জন্য প্রাসাদের গায়েই এক গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে পুরোহিতেরা যজনক্রিয়াদি করেন। ইতালীর লোকেরা যেমন রাজভক্ত তেমনি পোপভক্ত। তাহারা মহা ফাঁফরে পড়িয়াছে। এই বিবাদ যে শীঘ্র মিটিবে এরূপ আশা নাই। পোপ আপনাকে দেবোত্তর রোমের রাজা মনে করেন এবং রাজাকে অপহর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করেন। কোন কাস্থলিক নৃপতি রোমে আসিলে অগ্রে তাঁহাকে পোপের সহিত দেখা করিয়া পরে রাজার সহিত দেখা করিতে হয়—নহিলে পোপ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন না। রূষের সম্রাট্ শীঘ্রই রোমে আসিবেন। তিনি রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। তিনি কাস্থলিক নহেন। কিন্তু যে দিন তিনি পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন সে দিন তাঁহাকে রোমে যে রূষ এল্‌চির (Ambassdor) বাটী আছে সেই বাটী হইতে রওয়ানা না হইলে পোপ তাঁহার সহিত দেখা করিবেন না।

রোমের দেবালয় দেখার পর আমার কোমরের ব্যথা অত্যন্ত বেড়ে উঠিল। একেবারে চলচ্ছক্তিহীন। তাই ট্রামে কোরে আস্তে আস্তে ইষ্টিশাণে গিয়ে বোসে রহিলাম। আমার রোম দেখা হোয়ে গেল। দেশে ফিরে যাবার সময় ভাল কোরে পারী (Paris) ও রোম নগর দেখিয়া যাবো—মনে করেছিলাম।

আমি যখন ইষ্টিশাণে গেলাম তখন বেলা প্রায় চারিটা। গাড়ি রাত্রি নয়টার সময়। চুপ করে বোসে আছি—ভাব্‌ছি কি করি এমন সময় এক বহুভাষাবিৎ কর্ম্মচারী ( Interpreter ) এল। ইহার কাজ বিদেশীদের সাহায্য করা। বেচারি আমাকে খুব খাতির যত্ন কর্‌লে টিকিট কিনে দিলে ও গাড়িতে চড়িয়ে দিলে। একেবারে লণ্ডনের টিকিট লইলাম। টিকিটটা একখানা আট-দশ-পাতা-ছোট-খাতার মতন—পাতে পাতে ছাপ মারা অর্থাৎ যতগুলি টিকিট যাচাই করিবার (Checking) ইষ্টিশাণ আছে তাহাতে ততগুলি পাতা। প্রত্যেক জায়গায় এক একখানা কোরে পাতা ছিঁড়ে নেয়। ইতালী ভাষায় লণ্ডনকে লণ্ড্রা ( Londra ) বলে। কেন যে আমরা দেশ ও নগরগুলিকে ইংরেজের মতন বিকৃত কোরে বলি তা ত বুঝিতে পারি না। কালকোটাকে ইংরেজ কালকাটা ( Calcutta ) বলে আর আমরা একটু শুদ্ধ কোরে বলি কলিকাতা। কলিকাতা কথাটা না সাপ না বেঙ। ইংরেজের অনুকরণ করিলে ফিরিঙ্গি ছাড়া আর কিছু হওয়া যায় না। আর ও ভেবে কি হবে। গাড়ি আপন মনে লণ্ড্রার দিকে ছুটিল। পর দিন সকাল বেলা নয়টার সময় তুরীন ( Turin ) নগরে আসিল। খুব শীত রোমে। প্রত্যেক গাড়ির নীচে আগুন রেখে দিয়েছিল। একটা কোরে কাঁটা বা হাতল আছে—সেটা বাম দিকে সরালে গাড়ি খুব গরম হয়—মাঝামাঝি রাখলে মাঝামাঝি হয় আর ডান দিকে সরালে খুব ঠাণ্ডা হয়। তুরীণ ইষ্টিশাণে দেখি আর এক বন্দোবস্ত ; প্রত্যেক গাড়ীতে দুটো কোরে মোটা মোটা চৌকোণা লোহার থামের মতন কি রেখে গেলো। তার উপর বেশ পা রাখা যায়। আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গাড়ি যখন আরও উত্তরে উঠিতে লাগিল তখন পা দুটো ঠাণ্ডায় কালিয়ে যেতে লাগিল। কি জানি বাবু–লোহার থামগুলো কি জন্যে দিয়ে গেছে। আমি

তার উপর পা একেবারে দিই নি। হঠাৎ কিন্তু একবার তার উপর পা পোড়ে গেছে আর দেখি যে বেশ গরম। পা দুটো গরম কোরে বাঁচিলাম। তখন দেখি থামগুলি গরম জল পোরা—যাত্রীদের পা গরম রাখিবার জন্য। আমার গাড়িতে কেহ ছিল না যে বুঝিয়ে দেবে। গাড়ি আল্‌প্‌স্ (Alps) পাহাড়ের মাঝখানে এসে পড়িল। ভয়ানক ভয়ানক গিরি-সঙ্কট ও পর্ব্বতের পেটের (Tunnel) ভিতর দিয়া অতিবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। এক একটা পেট পার হইতে কম বেশে ১০।১৫ মিনিট কোরে লাগে। এখানকার কি মনোহর দৃশ্য। দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বত-মালা। তাহাদের শিরোদেশ স্থানে স্থানে তুষার-মণ্ডিত। পাহাড়ের ঢালু গায়ে ছোট ছোট গ্রাম আর সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় হরিৎ-শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে কল্লোলিনী নির্ঝরিণী সকল মেঘমণ্ডলের ছায়াপথের ন্যায়—দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের ন্যায়—পর্ব্বত-বক্ষ শোভিত করিয়া রেখাকারে প্রবাহিত হইতেছে। গ্রামগুলি যেন এক একটি আশ্রম। প্রত্যেক গ্রামে একটি কোরে দেবালয় বা গির্জ্জা আছে। এখানে সভ্যতার প্রকোপ কিছু কম তাই ধর্ম্ম বুঝি সহর থেকে পালিয়ে এসে এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় নিয়েছে। ছেলে মেয়েগুলি বেশ নাদুস নুদুস। গালগুলি পাকা করমচার মত লাল। পর্ব্বতের অত্যুচ্চ বরফাণ প্রদেশে কাথলিক সন্ন্যাসীদের (Monk) মঠ আছে। ইহাদের কাজ ধ্যানধারণা করা—গ্রন্থ লেখা আর অতিথি-সেবা করা। এই মঠ সকলে বড় বড় কুকুর আছে (St. Bernard's dog)। তাহারা আহার-পানীয় লইয়া রিয়া বেড়ায়। পথভ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত পথিকদিগকে আহার দেয় ও পথ দেখায়। আর যদি শীতে বিকলাঙ্গ হয় তাহা হইলে পৃষ্ঠে করিয়া মঠে লইয়া আসে। এই মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে (France) পরাঙ্ক দেশে আসিয়া পড়িলাম। প্রকৃতি এই দেশটীকে

বড় ভালবাসে। শুনেছি য়ুরোপে এমন সুন্দর দেশ আর নাই। সেই রকমই বোধ হোলো। ইতালীও মনোরম কিন্তু একাধারে এত সৌন্দর্য্য নাই। যেমন বড় বড় পাহাড় তেমনি নদী ও সমতল ভূমি। যাহা হউক গাড়ি ত এক নিশ্বাসে রাত্রি ১১ এগার টার সময় পারী নগরীতে এলো। নাপলীতে ১লা নবেম্বরে জাহাজ থেকে নামি। সেই দিন রাত্রিতে রোমে আসি। পরদিন ২রা রবিবার রাত্রিতে রোম ছাড়ি। তার পর দিন রাত্রিতে পারী। পারী নগরী আর দেখিলাম না। পরদিন বেলা নয়টার সময় গাড়ী। তাই কাজে কাজে শীতে হি হি করিতে করিতে একটা হোটেলে গেলাম। শুধু শোবার জন্য প্রায় দুই টাকা লইল। শোবার আরামের কথা আর কি বলিব। কম্বলে শোয়া অভ্যাস কিন্তু আয়েস বোধটা বেশ আছে বুঝা গেল। আমার প্রকোষ্ঠে একটা স্প্রিং খাট—শুলেই এক হাত নেবে যেতে হয়। তার উপরে দুগ্ধফেণনিভ শয্যা। দেওয়ালে একটা বোতাম টিপিলেই ঘরময় বিজলীর ( electric ) আলো। আর বড় বড় আরসী টেবিল-কাপড় রাখিবার দেরাজ ঘড়ি আর একটা হারমোনিয়ম। আরাম কোরে শুয়ে নেওয়া গেল। কম্বলে শুয়ে শুয়ে হাড়-মট্‌মটানি রোগ ধরেছিল। হাড় জুড়িয়ে গেল। তবে বৈরাগ্যটা না জুড়ুলেই বাঁচি। পারী নগরী হইতে রেলে নয়টার সময় গাড়ি ছাড়িল। সমুদ্রের বন্দরে বেলা ১২টায় পঁহুছিল। তারপরে জাহাজ। আবার তারপরে গাড়ি। অবশেষে উপনীত লণ্ডনে। তখন সন্ধ্যা। সেখানে সেই রাত কাটিয়ে তার পর দিন ৫ই উক্ষপারে (Oxford) আসিলাম। এখানে সেই অবধি আছি। এখানে প্রায় ১৮।২০ টা কালেজ আছে। দেশ দেশান্তর থেকে ছাত্রেরা পড়িতে আসে। সহরের দুই ধারে নদী। ইহার বর্ণনা পরে লিখিব। এখন আমার হাততালি খাবার কথা এক চোট হোয়ে গেছে। গত

মঙ্গলবারে আমি—হিন্দু চিন্তা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ( Hindu Thought and Western Culture )—বিষয়ে বক্তৃতা করি। এখানকার সংস্কৃত অধ্যাপক ( Boden Professor of Sanskrit ) এ-এ মগ্‌দানল্ব এম-এ সভাপতি ছিলেন। লোক জন মন্দ হয় নাই। কলিকাতার জজ ট্রিভিলিয়ান ( Trevelyan ) উপস্থিত ছিলেন। আমার বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে জীবন পথের জটিল সমস্যা ভঞ্জন করিতে য়ুরোপীয়েরা কেন হিন্দু চিন্তাপ্রণালীর সাহায্য না লয়। যুদ্ধের সময় ভারতের সৈনিক চাই। কিন্তু প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির যুদ্ধের সময় ভারতের দর্শন কেন না চাই। হিন্দু জাতি কেমন করিয়া সমস্যা ভঞ্জন করে তাহার দুই একটু নমুনা দেখাইলাম আর বলিলাম—শুধু সুখ্যাতি করিলে হইবে না—হাতে কলমে কোরে দেখিতে হবে—তা হোলে সুফল ফলিবে। খুব হাততালি। লোকে আরও বক্তৃতা শুনিতে চায়। আমিও তাই চাই।

নামটা একটু রোটে গেছে। ছোকরা মহলে কথা চোলেছে। অধ্যাপকেরাও কানাকানি করিতেছেন। যাঁরা সিভিলিয়ানদের পড়ান তাঁরা আমার খুব বন্ধু হোয়েছেন। এবং দুচার জন যারা সিভিলিয়ানি পাস কোরেছে ও শীঘ্র ভারতে যাবে তারাও বক্তৃতা শুনে খুসি হোয়েছে। এখানে কালেজ ১৩ই ডিসেম্বরে বন্ধ হবে। তার মধ্যে আমি তিনটি বিষয়ে বক্তৃতা করিব। প্রথম—হিন্দুর আস্তিক্যতত্ত্ব (Hindu Theisim)—২য় হিন্দুর নৈতিকতত্ত্ব ( Hindu Ethics )—৩য় হিন্দুর সমাজতত্ত্ব ( Hindu Sociology )। আমার ভাগ্য ভাল। বেলিয়ল ( Balliol ) কালেজের প্রধান অধ্যাপক (Principal এখানে Master বলে ) ডাঃ কেয়ার্ড ( Dr Caird ) আগামী বারে সভাপতি হইবেন। ইনি বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের একজন প্রধান দার্শনিক। সকলেই বলিতেছে এটা বড় সম্মানের বিষয়। বাস্তবিক

আমি এখানে অজানিত অপরিচিত—কোন সুপারিস চিঠিপত্রও আনি নাই। তবে ভাগ্যক্রমে আমার মাসিক পত্রিকায় (Twentieth Century) বেদান্তের আলোচনা মগ্‌দানল সাহেব পড়িয়াছিলেন—তাই বাঁচোয়া। তাই ত তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। আবার তার পরে ডাঃ কেয়ার্ড সভাপতি। আঙুল ফুলে কলাগাছ। এখন শেষ থাকিলে হয়। আগে থেকে ঢাক বাজিয়ে শেষে অপ্রস্তুত হওয়া বড় লজ্জার বিষয়। দেখি কিরকম হাততালি জমে। তার পর ডঙ্কা মেরে দেশে ফিরে যাবো। নহিলে চুপি চুপি পুনর্মুষিকো ভব। ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থা কিছু কিছু দেখেছি। এখন যাত্রা-বৃত্তান্ত সাঙ্গ হোয়েছে। এই বার একটু একটু সার কথা লিখিতে চেষ্টা করিব।

ইতি তারিখ ২০শে নবেম্বর—উক্ষপার।

---

# বিলাত-প্রবাসী

## সন্ন্যাসীর চিঠি।

( ৩ )

বিলাত-যাত্রীর দু-খানি চিঠি লিখেছি। এখন আমি বিলাতবাসী—তাই প্রবাসীর ছাঁদে লিখিতে বসেছি। বিলাত—কথাটার মানে কেহ কেহ বোধ হয় জানেন না। বিলায়েৎ শব্দে পারসীতে স্বদেশ বা বাড়ী বুঝায়। যাহা ইংরেজের বিলায়েৎ বা দেশ তাহাকে আমরা বিলাত বা বিলেত বলি। আমি অনেক দেশ-দেশান্তর ঘুরেছি—বিদেশ বোলে কোন কষ্ট কখনও অনুভব করি নাই। কিন্তু এবার সন্ন্যাসীগিরি ঘুরিয়ে দিয়েছে। কেবল আলু সেদ্দো আর কপি সেদ্দো খেয়ে খেয়ে বিদ্মি হয়েগেছে। মনে হয় দেশে ছুটে যাই আর একটা ঝালঝাল তরকারি ও তেঁতুল চেরার টক খেয়ে জিভটাকে শাণিয়ে নি। একটু সুরা আর মাংস গ্রহণ করিতে এখানকার বন্ধুরা আমাকে খুব পীড়াপীড়ি করেন কিন্তু আমি রাজি নহি। আর যা করি না করি—আমিষ মদিরা ও ইংরেজি পোষাক একান্ত পরিবর্জ্জনীয়। আমার স্বর্গীয়া পিতামহী বলিতেন—ছেলেগুলো নেকচর দিয়ে দিয়ে উচ্ছন্ন গেল। আমি ত উক্ষপারে এসে তিন তিনটে বক্তৃতা দিয়েছি। উচ্ছন্ন ত গেছি আর এই বক্তৃতার চোটে বঙ্গবাসীতে চিঠি লেখাও হয় নাই—পাঠক মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন।

এখানে প্রথম দিন রাস্তায় বেরিয়ে মহা বিপদ। ছেলেরা—দেখ দেখ (look look)—বোলে আমার পানে ছুটে আসে—পুরুষেরা মুচকে হাসে—

আর মেম সাহেবেরা একটু শিহরে উঠে বা অল্প দন্তরুচি-কৌমুদী বিস্তার করে। কেন না আমার রঙ ময়লা অর্থাৎ আমি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। লোকের ভিড় ঠেলে যাওয়া যায় কিন্তু নজরের ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠিতে হয়। তবে রক্ষা যে বেশী বাড়াবাড়ি করে না—সামলে আঁতকে উঠে বা হাস্যরস ছড়ায়। কিন্তু বেশ বুঝা যায় যে আমি একটা তাদের কাছে রকমারি জিনিস। আমার পোষাক এখন মন্দ নয় কারণ শীতের জ্বালায় একটা পা পর্য্যন্ত লম্বা গরম কোট দিয়ে গেরুয়ার ঝক্‌মকানি ঢাকিতে হয়েছে। যখন কোন সভায় যাই তখন কোটটা খুলে রাখি। আমি মনে করেছিনু কেবল আমারই এই দুর্দ্দশা। তা নয়। আমার সব দেশী ভায়াকে নজর শিহরুণি আর মৃদুমন্দ হাসি সহিতে হয়। তবে ইংরেজের পুষ্যিপুত্তুর সেজে হ্যাটকোট পরিলে—কতকটা গোঁজামিল দিয়ে বেঁচে যাওয়া যায়। কিন্তু একেবারে নিস্তার নাই। যদি রংটা খুব মটরডাল-বাটার মতন হয় আর খুব পুষ্যিপুত্তুরি করা হয়—তা হোলে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পোষাক যদি অন্যরকম কর—তা রেশমের জুব্বাই পর আর তাজই মাথায় দাও—একেবারে হৈ হৈ পোড়ে যাবে। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে যেমন চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ারদিগকে খোঁচা-খুঁচি থেকে বাঁচাবার জন্যে কাঠগড়ার ভিতরে রাখে তেমনি কোরে—অভিষেক উপলক্ষে সমাগত আমাদের দেশীয় সৈন্যদিগকে এখানে রাখিতে হোয়েছিল। তবে বড়মানুষি কোরে গাড়ি হাঁকিয়ে গেলে সাত খুন মাপ। ইংরেজ ঐশ্বর্য্যের কাছে পদানত। কিন্তু একবার আলাপ হোয়ে গেলে এখানকার লোকেরা অতি ভদ্রভাব ধারণ করে—হাসি টিট্‌কিরি সব ছেড়ে দেয়। কিন্তু যদি আবার একটু মনান্তর হয় ত অমনি blackie nigger, অর্থাৎ কালো সম্ভাষণটা অনেক সময় ইংরেজের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে সব ভারতীয় ভায়ারা এই কালো রঙের উপর

কটাক্ষের জ্বালায় ত্রস্ত। রাস্তায় একজন ভারতবাসীর সঙ্গে আর এক-জনের দেখা হোলে এক হাত দূর সাত হাত হয়—পাছে মিল হোলে গোঁজাটা বেরিয়ে পড়ে এবং হাসির পাত্র হোতে হয়। আমাদের দেশে কালোয়-ধলোয় মিল উচ্চ-অঙ্গের মিল—যথা রাধা-কৃষ্ণ—গঙ্গা-যমুনা। কিন্তু সভ্যতার নতুন-বাজারে কালোয়-ধলোয় মিশ খাবে না খাবে না। ভ্রাতৃভাবগ্রস্ত দুচার জন কালো কালো সংস্কারককে একবার বিলেতের রাস্তায় হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেই তাঁরা ভাবের বুলি ছেড়ে দেবেন। আর বেশী কিছু করিতে হবে না তাঁদের মুখ বন্ধ করাতে। যতদিন সভ্যতার বড়াই ততদিন মিল অসম্ভব।

এখানে একজন দেশী ভাই আছেন—তাঁর স্বদেশের নামে বমি আসে আর বিলেত এই কথা শুনিলেই লাল পড়ে। এর কারণ আছে। সভ্যতার একটা দিক্ আছে যেটা বড়ই মধুর। এত ছটা ঘটা মাধুরী যে মন একেবারে মুগ্ধ হোয়ে যায়। একে ত প্রকৃতি অমনিতেই পুরুষকে পেড়ে ফেলেছে তার উপর আবার রঙ চড়ালে বাঁচা দায়। কলিকাতার জলের কল দেখে একজন বলেছিল—"কি কল বেনিয়েছে কোম্পানি সাহেব।" বিলেত দেখিলে সেইরকম একটা কিছু বলিতে ইচ্ছা যায়। একবার দোকান সাজান দেখিলে মনে হয় যেন রূপের বাজারে এসেছি। মাছের দোকানে মাছ সাজিয়ে রেখেছে—যেন ফুলের কাতার। খুব নিশ্বাস না টানিলে গন্ধ পাওয়া যায়না। অত কথায় কাজ কি—বড় বড় অখাদ্য মাংস এমনি সাজিয়েছে যে হিন্দুর ছেলে হোয়েও দুচার বার নজর না দিয়ে থাকা বড় মুস্কিল। কি মাছ-মাংসের দোকান—কি শাক-সবজির দোকান—কি বসন-ভূষণের দোকান—যা দেখ—যেন চারি দিকে ফুলের মালা গেঁথে রেখেছে। আর শৃঙ্খলার একেবারে চূড়ান্ত। কাতারে কাতার লোক চল্‌ছে, একটুও কোলাহল নাই। হাজারে হাজার ঘোড়া গাড়ি

দৌড়িতেছে কিন্তু ঠিক যেন কলের পুতুল। একবার যদি পাহারাওয়ালা হাত তোলে ত অমনি সব গাড়ী খাড়া। লণ্ডনের রাস্তায় এত লোক যে মনে হয় বুঝি মেলা বসেছে। তার উপর ট্রাম অমনি-বস ভদ্র-লোকের গাড়ী ভাড়াটে গাড়ী বাইসিকল মটর-কার বেগে ধাবমান। এত ভিড় কিন্তু ঠেলাঠেলি নাই— চেঁচাচেঁচি নাই। শৃঙ্খলার বিশেষ পরিণতি না হোলে এরূপ বৃহৎ ব্যাপার অত সুনিয়মে চলে না। আর রাস্তা ঘাট ঘর দুয়ার সব এত পরিপাটী যেন ঝক্‌মক্ করিতেছে। বাড়ীগুলি যেন এক একখানি ছবি। আমাদের কলিকাতার চৌরঙ্গী বা ইংরেজটোলা লণ্ডনের ভাল জায়গার একটি মেকি—কাপি বা অনু-করণ। আর আয়েসের কথা কি বলিব। খাওয়া-দাওয়া নাওয়া-শোয়া বসা-দাঁড়ান সব কাজে এত আরাম কোরে তুলেছে যে ইন্দ্রলোকে এর চেয়ে আর কি হোতে পারে তা ত ভেবে পাওয়া যায় না। আমি এখানে দুটি আরাম সম্ভোগ করেছি। স্নান আর ক্ষৌরি। ক্ষৌরির কথাটাই বলি। একটি পাথরের টেবিল—তার উপরে একখানি প্রকাণ্ড আয়না। সম্মুখে একখানি কেদারা। কেদারার পিছনটি স্প্রিংএ উঠান-নামান যায়। তাহাতে অর্দ্ধেক চিৎপাত হোয়ে ঠেসান দিয়ে বসিতে হয়। তার পরে সাহেব নাপিত "Good morning" গুডমরনিং কোরে ঈষদুষ্ণ গরম জলে গোলা সুগন্ধ সাবান বুরুস দিয়ে—দাড়ি ও গোঁপ ঘষে ও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। পাঁচ সাত মিনিট ফুলের মতন বুরুস বুলিয়ে ক্ষুর ধরে। ক্ষুর এমনি দাড়ির উপর চালায়—যেন তুলি। তার পরে আবার সাবান ঘষা। আবার উজান কামানো। কামিয়ে একটা নরম স্পন্জ গরম ও ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে—ঠাণ্ডা ও গরম জলের কল পাথরের টেবিলে লাগান আছে—মুখে বুলায় ও সাবান পুছিয়ে দেয়। তার পর এসেন্সের পিচ-কারি—আবার তার উপর পাউডার। এত কারখানা—আর তুমি মজা

কোরে বোসে বোসে আয়নাতে দেখ—সাহেব পরামাণিক কেমন তোমায় কেয়ারি করিতেছে। কি যে আয়েস তা বুঝিয়ে উঠা দায়—তবে পিচকারি ও পাউডারের সুখটা আমি ভোগ করি নাই—কেন না ওটা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। এত বিলাস সুখ এখানে আছে কিন্তু নিষেধের জ্বালায় সে সব অঙ্গীকার করিতে পারি না। বঙ্গবাসীর আর কেহ পত্র-লেখক হোলে ভাল হোতো। কত নাচ তামাসা আহার-পানের মজা।

কিন্তু আমার কপালে তা নাই।

উদ্দাম-প্রবৃত্তি যুবকদের প্রথম দৃষ্টিতে মনে হোতে পারে যে ভারতে না জন্মানই ভাল ছিল। তাই দেখা যায় যে যত যুবক এখানে আসে—অধিকাংশই সাহেব হোয়ে সাহেবি বিলাসিতায় ডুবে মরে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখিলে মোহ ঘুচে যায়। এখানকার গৃহস্থদের জীবনে শান্তি নাই। এত বেশী জিনিস-পত্তর দরকার যে তারা কুলিয়ে উঠিতে পারে না। আর দিন্‌কের দিন খুটি-নাটি বাড়ছে। আমি অতি সামান্য রকমে একটি গৃহস্থের বাটীতে থাকি। তবু আমার বাসা ভাড়া ও খাবার জন্যে মাসিক ৬৩৲ টাকা দিতে হয়। আমার একটি বসিবার ঘর ও একটি শোবার ঘর। ঘর দুটি ছোট ছোট কিন্তু এমনি সাজান যে কলিকাতার বড় মানুষের বৈঠকখানা হোতে কোন অংশে কম নয়। টেবিল কেদারা কোচ দেরাজ ও ভাল ভাল ছবিতে বসিবার ঘরটি সুশোভিত। নীচে কারপেট—জানালায় সাপের খোলসের মতন পরদা। শোবার ঘরে স্প্রিংএর খাট—শুইলেই এক হাত নেবে যায়—তায় আবার গদির উপর গদি। এক দিন একটা পরদা কিরকম লাগান হয় নাই—তাই গৃহিণী আমার নিকট ক্ষমা চাহিতে এসেছিল। আমি মনে করিলাম ভাল রে ভাল—তোমার পরদা কোচ সরিয়ে নিয়ে যাও—আর কিছু ভাড়া কমিয়ে দাও। কিন্তু এখানে এর চেয়ে সস্তা বাসা পাওয়া যায় না। আর যাদের

স্ত্রী-পুত্র আছে—তাদের যে কত কি আবশ্যক, তার অবধি নাই। তাই এখানে ভদ্রলোকেরা ব্যস্ততার চক্রে পিষ্ট। জীবন ধীরে সুস্থে চালালে চলে না। যেন কেবলই ভিড় ঠেলে চলিতে হয়। আমাদের দেশেও এইরূপ দুর্দ্দশা দাঁড়িয়েছে। তবে সেখানে এক মুষ্টি অন্নের জন্য দৌড়া-দৌড়ি করিতে হয় আর এখানে সাপের খোলসের মতন চিকণসই পরদা ও দারা-সুতের নিমন্ত্রণ খাইবার পোষাকের জন্য ছুটোছুটি করিতে হয়। আমাদের যেমন এক মুষ্টি অন্ন তেমনি এদের পরদা ও বিলাস-বেশ—

নহিলে মানসম্ভ্রম একেবারে থাকে না।

আর একটী বড় ভয়ের কথা। এখানকার কর্ম্মজীবী লোকেরা বড়মানুষ-দের উপর বড় চটা। সে দিন একটী মোকর্দ্দমায় একজন বড় ঘরের মেয়ের ৭৫০৲ টাকা জরিমানা হোয়ে গেছে। এঁর একটী পাগলাটে কন্যা আছে। ইনি তার প্রতি বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। তাই বালক-বালিকার প্রতি নিষ্ঠুরতা-নিবারিণী সভা এঁর নামে নালিশ করেছিল। এ আবার বিলাতের এক উদ্ভুটে ব্যাপার। মা-বাপ যদি একটু কড়া হয় ত অমনি নিষ্ঠুরতা-নিবারিণী সভার হাতে পড়িতে হয়। যা হউক—জজ এই নিষ্ঠুর মাতাকে কেন জেলে দিলেন না—কেবল জরিমানা করিলেন—এই নিয়ে একেবারে হুলুস্থুল পড়ে গেল। কর্ম্মজীবীরা সংবাদ-পত্রে ভয়ানক প্রতিবাদ করিতে লাগিল যে কেবল বড়মানুষের ঘর বোলে এই অল্প সাজা দেওয়া হোয়েছে—আমাদের ঘর হোলে নিশ্চয়ই জেল হোতো। জজকে একেবারে উত্তম ফুত্তম কোরে তুলেছিল। ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে বড়মানুষে আর গরিবে একটা ভয়ানক বিদ্বেষ ভাব দাঁড়াইতেছে। এখানে একটী কর্ম্মজীবীদের বিদ্যালয় আছে। দেশ বিদেশ হোতে ছুতার রাজমিস্ত্রী কামার দরজী—এইরূপ লোকেরা এসে পড়াশুনা করে। তারা এক দিন আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল। তাদের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়েছে।

কিন্তু তাদের বড়মানুষদের উপর যে রাগ দেখিলাম তাতে বড় ভয় হয়। এরা ভাল লোক কিন্তু দায়ে পোড়ে বিদ্বেষভাবাপন্ন হোয়েছে। সভ্যতার বাজারে এত টানাটানি যে এরা সামলে উঠিতে পারে না। তাই এরা বর্ত্তমান সমাজের দ্রোহী হোয়ে উঠিতেছে। আর যাদের তেলা মাথায় তেল—এরা তাদের দেখে একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে যায়। আমি ইহাদিগকে আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা অল্প স্বল্প বলিলাম। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়িয়া কৌলিক কর্ম্মকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা শুনিয়া ইহারা বিস্মিত হইল কিন্তু ইহা যে শান্তিপ্রদ তাহা বার বার স্বীকার করিল। ইহারা বেশ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্। এই সমাজ-দ্রোহিতা—সভ্যতার একটী অঙ্গ। ইহাই ধর্ম্মঘট স্থাপন করে এবং ধনী ও কর্ম্মীতে শত্রুতা বাধায়। প্রতিযোগিতায় যার চালাকি আছে সেই খুব মেরে দেয় আর যে বেচারি ভাল মানুষ তার সহস্র সহস্র গুণ থাকিলেও কিছু সুবিধা হয় না। এই সমাজের ভয়ানক অসামঞ্জস্য-ভীতি য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে।

এই ত গেল ভয়ের কথা। সভ্যতার একটী শোচনীয় ব্যাপার আছে। সেটি ভয়ানক দারিদ্র্য। সহরে ভারি শোভা—পূর্ণমাত্রায় আয়েস ঐশ্বর্য্য—কিন্তু পশ্চাদ্ভাগের অলিতে গলিতে বড়ই দারিদ্র্য। দেখিলে প্রাণ ফেটে যায়। ছোট ছোট পায়রার খোপের মতন ঘর—তাতে স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়ের গাদাগাদি। ঘোর শীতে অগ্নি নাই—এখানে ঘরে আগুন নহিলে তিষ্ঠিবার জো নাই—বস্ত্র নাই আহার নাই। সকলে কাজ করিবার জন্য লালায়িত কিন্তু সহরে কাজ কর্ম্ম পায় না। এমন একজন আধজন নয়—শত শত সহস্র সহস্র। এই অমরাবতীর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কত লোক শীতে ও অনাহারে প্রাণ হারাইতেছে। কি দুঃখের কথা—কি লজ্জার কথা—আবার এমনি চমৎকার আইন

যে ভিক্ষা করিবার হুকুম নাই। রাস্তায় দেখিতে পাইবে যে দীনহীন রমণীরা ছেলে কোলে শীতে হি-হি কোরে কাঁপ্‌ছে আর দুই একটা শুক্‌নো ফুলের তোড়া বা ভাঙ্গা দেশলাইয়ের বাক্স বিক্রী করিবার ছল কোরে ভিক্ষা চাহিতেছে। বড় বড় ঘাঘরা—বড় বড় টুপি কিন্তু তাহাদের পানে কেহ ফিরেও চায় না। সে দিন একজন রমণী আমার কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে ফুলের তোড়া বিক্রী করিতে এলো। আমি ভারি গরীব তবুও তাকে এক সিলিং—বারো আনা দিলাম। কিন্তু অমনি একজন ইংরেজ নারী বোলে উঠিল—ছি—কালোমানুষের কাছ থেকে ভিক্ষা নিলি। যাহা হউক এত ধনের মধ্যে অনাহারে মরে যায়—ইহাই বড় প্রাণে লাগে। সে দিন দুইটী স্ত্রীলোকের কথা শুনে অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারি নাই। তারা দুটী বোন। একজন অনাহারে মরে পড়ে আছে আর একজন ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষেপে গেছে। পুলিশ এসে মরা ও ক্ষেপা দুজনকে বের করে নিয়ে গেল। এমন সভ্যতার মুখে ছাই। আমি ত দেখে শুনে ধিক্কারে মরি। আমার আলোকে কাজ নাই—আমার রংচংএ কাজ নাই। আমাদের অসভ্য দেশ অসভ্যই থাক্। শান্তি আমাদেরই ইষ্টদেবতা—ঠেলাঠেলি মারামারি আমাদের কাজ নাই। জিগীষার কাড়াকাড়ি হোতে ভগবান্ রক্ষা কর। হিন্দুসন্তান সভ্যতার প্রবৃত্তিপরায়ণতা হোতে বাঁচুক ও নিষ্কাম হইয়া কুল-ধর্ম্ম পালনে রত হউক।

বিলেতে এসে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা কিছু না বলিলে ভাল দেখায় না। সাংখ্যদর্শনে বলে যে প্রকৃতি যখন অবগুণ্ঠন খুলে আপনার স্বরূপ জানায় তখন পুরুষের মুক্তি হয়। এখানে প্রকৃতি অবগুণ্ঠিতা নহে। মাঠে ঘাটে হাটে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া রাখে। এখানকার পুরুষেরা তবে সাংখ্যমতে মুক্ত। সাংখ্যমতে হউক আর না হউক আমাদের বিলাত-প্রবাসী দেশী ভায়াদের মতে সাহেবেরা মুক্ত পুরুষ। কেননা

প্রকৃতিকে তারা অবাধে দেখে। এইরূপ মুক্তি দেশে আমদানী করিবার জন্য এরা ব্যস্ত। বাস্তবিক এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা একটা অদ্ভুত কাণ্ড। আমাদের দেশে যে নাই তাহা নয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যে স্ত্রী-লোকেরা বাহিরে যায়—বাজার করে ঘুরে ফিরে বেড়ায়। কিন্তু এখানে রকমই আলাদা। দলে দলে স্ত্রীলোকেরা চলেছে—কেহ দৌড়িতেছে—কেহ হাসিতেছে—ভ্রূক্ষেপই নাই। আবার কত স্বামী-স্ত্রী হাত ধরাধরি কোরে চলেছে। যুগল-মূর্ত্তি দেখিলে আনন্দ হয়। কিন্তু যুগল মূর্ত্তির বিশেষ খেলা প্রণয়-সূত্রে চলে—পরিণয়-সূত্রে নহে। প্রায়ই দেখা যায়—কুমার-কুমারীরা বাহুবন্ধনে মিলিত হোয়ে বিহার করিতেছে—কিম্বা আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে বা বোসে রয়েছে। আমি একটু নির্জ্জন জায়গা পছন্দ করি। তাই অপরাহ্ণে প্রায় ঝোপ ঝাড় ঘেসে বেড়াইতে যাই। বাগানে এ সব ঝোপ তৈয়ারী করা। কিন্তু ক্রমশঃ দেখি যে সবগুলিই প্রেমালাপে পরিপূর্ণ। তাই আমাকে এখন সামলে চলিতে হয়। কিন্তু এখানকার লোকেরা প্রণয়ের সুতো পাকানকে একটা অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করে। যাহাদের বিবাহ স্থির হোয়ে গেছে তারা অত ঘোরাঘুরি করে না। কিন্তু বিবাহ স্থির কি অস্থির—সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্যই পুরুষপ্রকৃতি কুঞ্জপুঞ্জের বিরলতা খোঁজে। ইহা ভাল কি মন্দ—তার বিচারে আবশ্যক নাই। তবে আমাদের দেশে এই প্রণয়ের কর-পীড়ন বা উৎপীড়ন যাতে না রপ্তানী হয়—সেই দিকে দৃষ্টি থাকিলেই ভাল।

আগামী বারে উক্ষপারের বিবরণ লিখিব মনে করিতেছি। ইহা একটী অতি পুরাতন বিদ্যালয়ের স্থান। বাইশটা না তেইশটা কালেজ আছে। এক একটা কালেজ পাঁচ সাত শত বৎসরের। স্থানটী অতি রমণীয়। উক্ষপার তারিখ ২রা জানুয়ারী ১৯০৩।

# বিলাত-প্রবাসী

## সন্ন্যাসীর চিঠি।

( ৪ )

অক্ষফর্ড নগরকে সংস্কৃত ভাষায়—উক্ষপার—শব্দে অভিহিত করিলে মন্দ হয় না। ইংরেজিতে অক্স্ অর্থে উক্ষ—আর ফোর্ড অর্থে পার। তা হোলে অর্থ ত বজায় থাকেই আর শাব্দিক মিলও কতকটা হয়। নগরটি তিন দিকে দুইটি নদীর দ্বারা বেষ্টিত। নদী দুটি আট দশ হাত চওড়া হবে। স্রোত অতি মৃদু এবং জল সুনির্ম্মল। নগরের চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। কতকগুলি গোচারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশই ছাত্রদের ক্রিকেট বা ফুটবল বা গল্‌ফ খেলিবার নিমিত্ত অতি যত্নে ও ব্যয়ে সুরক্ষিত। মাঠের অপর পারে আবার শ্যামলবৃক্ষাচ্ছাদিত ছোট ছোট পাহাড়। নদী মাঠ ও পাহাড়—তিন মিলে স্থানটিকে অতি রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। পুরা-কাল হোতে এই জায়গায় বিলাতী সন্ন্যাসীদের ( মঙ্ক ) বড় বড় মঠ ছিল। সেই মঠের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগের জন্য আয়তন ( কালেজ ) নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালেজ কথাটির ধাতুগত যে অর্থ—আয়তনেরও সেই অর্থ। সংস্কৃতে কালেজকে আয়তন বলে—সেটা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। ধনবান্ ভক্তেরা ছাত্রদিগের আবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিত এবং ভরণপোষণের জন্য বিপুল অর্থ দান করিত। এইরূপে উক্ষপারে অনেক কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এক ভয়ানক ধর্ম্মবিপ্লব ঘটে। সেই অবধি

ইংরেজজাতির মনে সন্ন্যাস-আশ্রমের উপর বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। কালেজ ইংলণ্ডের রাজা সন্ন্যাসীদিগকে দূর করিয়া দিয়া মঠ সকল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন ও দেবোত্তর সম্পত্তিগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। কাজে কাজেই আয়তনগুলি এখন সরকারি খাসে আসিয়াছে। এই মঠ ভাঙ্গার পর আরও গুটিকয়েক কালেজ হইয়াছে। এখন এখানে সর্ব্বশুদ্ধ তেইশটি কালেজ। প্রত্যেক কালেজেই ছাত্রাবাস আছে। তবে সকল ছাত্রেরই থাকিবার জায়গা হয় না। বাকি ছাত্রেরা বাসা করিয়া থাকে। কিন্তু সেই বাসা সকল কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় ও কতক পরিমাণে শাসিত হয়। কতকগুলি লোক নিযুক্ত আছে—যাহারা ছাত্রদের বাসার তত্ত্বাবধারণ করে এবং রাস্তা ঘাটে তাহাদের চালচলনের উপর নজর রাখে। তবে ছাত্রদের স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা খুব। অধ্যাপকদের সামনে খুব চুরুট টানে ও তামাক (পাইপ) ফোঁকে। তারা থিয়েটারে প্রায়ই যায় ও সেখানে গিয়ে এমনি বেল্লেলাগিরি করে যে দেখে পিলে চমকে যায়। অধ্যাপক মহাশয়েরা সেই রসরঙ্গের ভিতর ডুবে লুপ্তপ্রায় হোয়ে বোসে থাকেন। ছাত্রেরা সুরাপান করে কিন্তু মাতাল হোলেই শাস্তি পায়। তবে কখন কখন নেশাটা একটু গোলাপিরকম হোলে ছাত্র মহাশয় দরজা জানালায় খড়খড়্ শব্দ কোরে অধ্যাপকদের ভীতি উৎপাদন বা নিদ্রাভঙ্গ করিতেও ছাড়েন না। বিলাতী সভ্যতা এইরূপই।

এখানে শীতকালে আটটার সময় সূর্য্য উঠে। তবে প্রায়ই উঠে না—মেঘে ঢাকা থাকে। আটটার সময় ছেলেদের গির্জ্জা হয়। বেলা নয়টার সময় আহার। দশটা হইতে একটা পর্য্যন্ত কালেজ। আবার আহার। তার পর দুটা থেকে চারিটা পর্য্যন্ত খুব খেলা বা নৌকা-বাহন—যাহার যা ইচ্ছা। পাঁচটার সময় চা পান। আবার তার পর

গির্জ্জা। সাতটার সময় শেষ আহার (ডিনার)। এই রাত্রি-ভোজনের পর ছেলেরা প্রায়ই সব বেড়াতে বেরোয় বা থিয়েটারে যায়। রাত বারটার মধ্যে কিন্তু সকলকেই ফিরে আসিতে হয়। এখানে খেলা আমোদটা খুব অধিক। পড়াশুনার চাপ বড় বেশি নয়। দুই মাস করিয়া পড়া হয় আর পাঁচ হপ্তা ছুটি। আর গ্রীষ্মকালে একটা মস্ত লম্বা চারি মাসের অবসর। প্রত্যেক কালেজে একজন কোরে অধ্যাপক (Tutor) আছেন—যিনি ছেলেদের অধ্যয়ন-বিষয়ে সাহায্য করেন ও কোন কালেজে গিয়ে কোন বিষয়ের বক্তৃতা শুনিলে ভাল হয়—তাও ঠিক করিয়া দেন। একটা কালেজে হয়ত ইতিহাস ভাল হয় আর একটা কালেজে হয়ত দর্শন বা ন্যায় ভাল। ছেলেরা এ-কালেজ থেকে ও-কালেজে ছুটোছুটি করে আর ভিন্ন ভিন্ন কালেজের অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনে। তেইশটা কালেজ বটে—তবে সর্ব্বশুদ্ধ বোধ হয় দু হাজার ছেলে হবে।

এখানে 'বডলিয়ান লাইব্রেরি' নাম একটি পুস্তকাগার আছে। তাহাতে প্রায় পাঁচলক্ষপুস্তক। বেলা দশটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। প্রত্যেক পাঠককে টেবিল চেয়ার দোয়াত কলম ও কাগজ দেওয়া হয়। একখানি কাগজে পুস্তকের নাম ও নম্বর (তালিকায় সব ঠিক করা আছে) লিখিয়া দিলেই অমনি একজন কর্ম্মচারী পুস্তকখানি দিয়া যায়। এখানে বড় বড় লোকেরা আসিয়া লেখা পড়া করে। অনেকে আসে যায় কিন্তু টুঁ শব্দটি নাই। ইহা সরস্বতী দেবীর একটি পীঠস্থান বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। পড়িবার জন্য একটি কপর্দ্দকও দিতে হয় না। কেবল একজন মেম্বরের দ্বারা উপনীত হইলেই হইল। বাস্তবিক একবার এখানে গেলে আর সহজে ফিরে আসিতে ইচ্ছা করে না।

যারা শ্রমজীবী বা মসী-জীবী নয়—তারা সকলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বেড়াতে যায়। আমিও তার মধ্যে একজন। এখানের একটি সুবৃহৎ উদ্যান আছে। হন্ হন্ কোরে চলিলে পনেরো মিনিটে ঘুরে আসা যায়। ইহা একেবারে নদীর ধারে। মাঝখানে মস্ত মস্ত খেলার মাঠ আর চারিধারে বৃক্ষলতা। এই উদ্যান হইতে একটী সুদীর্ঘ পথ বাহির হইয়াছে। এই পথটীর দুইধারে নদী। ছেলেদের নৌকা বাওয়ার সুবিধার জন্য ক্রোশখানেক ধোরে নদীটীকে আটকের দ্বারা ফাঁপিয়ে সদাই জলপূর্ণ কোরে রাখা হয়। তাতে যে জল উপচে উঠে তাহা পশে একটি খালের দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই খালটী আটকের কাছে গিয়ে আবার নদীতে মিলেছে। নদী ও খালটীর মাঝখানে এই পথটি তৈয়ারী। ইহার দুই পার্শ্বে সারি সারি এলম্ গাছ। শীতে এখন গাছ গুলিতে একটিও পাতা নাই। এই পথটি অতি নিভৃত শান্ত। আমি এই রাস্তায় প্রায় বেড়াইতে যাই। এ রাস্তা ছাড়িয়ে একটা ছোট পাহাড়ে উঠি। আবার পাহাড় থেকে নেমে নিকটস্থ এক পল্লীগ্রামে যাই। যাওয়া আসাতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগে। পল্লীগ্রামে চারিদিকে ক্ষেত ও বাগান। এমন আধ হাত জায়গা দেখিতে পাওয়া যায় না যার উপর মানুষের কারিকুরি নাই। গোচারণের মাঠগুলির ঘাসও বেশ কেয়ারী করা। চারিদিক একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রকৃতিকে ছেঁটেছুঁটে দোরস্ত কোরে যেন সাজানো হোয়েছে। প্রথমটা দেখিলে বড় ভাল লাগে। তার পরে কিন্তু মনে হয়—খোদার উপর কিছু বেশি মাত্রায় খোদকারী করা হোয়েছে। স্বভাবের স্বাভাবিক শোভাটা লোপ পেয়েছে। আমাদের পাড়াগাঁয়ে কত না বন-জঙ্গল। কিন্তু তাতে একটা পরমানন্দের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়—যেন সৌন্দর্য্যের মেলা লেগেছে—শ্রীনিবাস যজ্ঞি ফেঁদে বোসেছেন—ফেলা-

ফেলি ছড়াছড়ি। আর এখানে যেন হিসাব কোরে গুণে-গেঁথে ফুল-ফল-শস্য-গাছ-পালা আমদানী করা হোয়েছে। লোকে বিলাতের শীতের বিষয়ে আমায় বড় ভয় দেখিয়েছিল। আর এখানে আমার সাহেব বন্ধুরা প্রায়ই আমায় দয়াপ্রকাশ কোরে বলেন—শীত সহিতে পারিতেছ ত। আমার কিন্তু মনে হয়—পঞ্জাবে এখানকার চেয়ে শীত অধিক। এখানে আমি যদি একটু বেড়িয়ে আসি ত অমনি দরদর কোরে ঘাম পড়ে। ঘরে সদাই আগুণ জ্বালাতে হয় কিন্তু আমার ত তত আবশ্যক বোধ হয় না। আমি সাতটার সময় উঠি আর একচক্র ঘুরে আসি। তখন অন্ধকার, ঠিক যেন আমাদের দেশে পাঁচটা বেজেছে। আর আমার কাপড় চোপড়ের অবস্থা তথৈব চ। তার উপর আবার মাংস মদিরা খাই না। লোকে বলে তোমার ধাতে গরমি বেশী। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি আমার মেজাজ একেবারেই গরম নয়। এখানকার শীত আমার বেশ লাগে। আমার শরীর বড় ভাল আছে। বোধ হয় যেন দশ বৎসর পরমায়ু বেড়ে গেছে। তবে পয়সার অভাবে ভাল কোরে দুধ ও ফল খেতে পাই না। তা না হোলে বোধ হয় বিশ বৎসর বেড়ে যেতো। যাক্—বড়াই করিব না। নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ—অহঙ্কার করিলেই পড়িতে হয়। কেবল মনে মনে বড় রাগ হয় যে এখানে দিনের পর দিন চলে যায়—তবু সূর্য্য উঠে না। আকাশ সদাই মেঘে ঢাকা। যদি এক দিন সূর্য্য উঠিল ত লোকের মুখে আর হাসি ধরে না। সূর্য্যের তাপটা কিন্তু কি রকম। বেলা একটার সময় যেন কলিকাতায় আটটা বেজেছে। তাই তাদের হাসি দেখে আমার হাসি পায়। আমার চেহারাটা ক্রমশঃ লাল হোয়ে উঠ ছে। আমি চুণোগলি ছাড়িয়া চৌরঙ্গীর ঘেঁসাঘেসি ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মিলিতে পারি। তবু আমায় দেখে রাস্তায় শিহরুণি-আতকানি-হাসি ঘোচেনি। এখানে এক জন

ভারতবাসী আছেন। ইনি ঝন্‌ঝনে সংস্কারক। ইংরেজদের উপর খুব টান। এঁর রঙটা একেবারে নবজলধর-শ্যাম। কিন্তু আমার কাছে এর বায়নাখ্যা ভাঙ্গেন নাই। সেদিন আমি খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করিলাম। ইনিও আমায় খুলে বল্লেন যে মাঝে মাঝে ছেলের দল এ কে তাড়া করে। আমার কপাল ভাল যে অতটা দুর্দ্দশা এখনও হয় নাই। ইংরেজের উপর বেশি টান বোলেই বুঝি এ র সঙ্গে এত টানাটানি। ইনি ইংরেজের মতন পোষাক করেন। তবে যেদিন নাইট ক্যাপ (Night-Cap) ছেড়ে কালো রঙের উপর লাল পাগ্‌ড়ি চড়ান সেদিন একেবারে—ত্রাহি মধুসূদন।

এই বিদ্যার পীঠস্থানে কতকগুলি মহাবিদ্যা আছেন—যাঁরা কেবল নূতন খুজে বেড়ান। এ রা ভারতবাসীদের সঙ্গে ভাব করিতে বড় অভিলাষিণী। কেহ প্রবীণা কেহ প্রৌঢ়া কেহ মধ্যম-বয়স্কা কেহ বা যুবতী। এঁদের চালচলনে শীলের কোন অভাব নাই। কিন্তু দেশের সমাজ বা সমাজ-বন্ধন—এ দের ভাল লাগে না। ছট্‌কে বেরুতে পারিলে এরা বাঁচেন। আমায় দুই একবার নিমন্ত্রণ কোরেছিলেন। কথাবার্ত্তা আলাপ-পরিচয় সব হোলো কিন্তু আমি বড় ঘেস দিই না। সব সওয়া যায় কিন্তু যারা নিজের দেশের উপর চটা—যে দেশেরই তারা হোক না কেন—তাহাদিগকে সওয়া যায় না। এরকম পুরুষও অনেক আছে। উৎকপারে যাঁরা বিদ্বান্ ও প্রতিষ্ঠাপন্ন—তাঁরা ভারতের উপর বিশেষ ভক্তিমান্ নহেন। তবে গুর্‌খা ও শিখ ভারি যোদ্ধা আর রাজা রাজোয়াড়ারা রাজভক্ত—এইটুকু স্বীকার করেন।

মাইণ্ড (অর্থাৎ মনঃ) নামক একটি দার্শনিক পত্র আছে। যত বড়বড় ইংরেজ দার্শনিক—তাঁরা সকলেই ইহাতে লিখেন। হিন্দু ব্রহ্মজ্ঞান—নামক আমার বক্তৃতাটি প্রবন্ধাকারে লিখে মাইণ্ডের

সম্পাদকের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি প্রথমে প্রবন্ধটি গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না—কেননা তাঁহার মাসিক পত্রের জন্য এক বৎসরের কাপি জমে পোড়ে আছে। কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। বেদান্তের কথা শুনে হেসে বলিলেন—খুব একটা ব্যাপার বটে, কিন্তু এখনকার কালে ও সব চক্ষুবুজুনি দর্শন আর চলিবে না।—কথা চলিতে লাগিল। কিছু আকৃষ্ট হোলেন। আমায় আর একদিন কথাবার্ত্তার জন্যে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমার প্রবন্ধটা রেখে এলাম তার পরে যে দিন গেলাম সে দিন তিনি বলিলেন—প্রবন্ধতে নূতন কথা আছে—যে রকম ব্যাখ্যা করা হোয়েছে তাতে বোধ হয়—বেদান্ত পাশ্চাত্য দর্শনের অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত—আমি এ প্রবন্ধ প্রকাশ করিব।—আমার প্রবন্ধে জীব ও জগৎ যে মিথ্যা ও মায়ার রাজ্যে যে কোন স্বাধীনতা নাই—তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর পাশ্চাত্য দর্শনে যে মায়িক অলীকতার প্রতিবাদ আছে তাহারও খণ্ডন করা হইয়াছে। যাহা হউক আনন্দের বিষয় যে আমার প্রবন্ধ মাইণ্ডের মতন সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় বাহির হইবে। আরও আরও অনেক বিদ্বান্ এখানে আছেন যাঁরা দেশের মাথা—কিন্তু ভারতের দর্শন-জ্ঞান তাঁদের কাছে কোন পুরাণ কালের বৃহৎ জন্তুর (ম্যামথের) মত—মিউজিয়মে রেখে দিবার জিনিস। মোক্ষমূলর অনেক দিন উক্ষপারে পরিশ্রম করিয়াছেন বটে কিন্তু তার ফল দাঁড়িয়েছে যে বেদ অল্প-অল্প-সভ্য কৃষক-দের গান—উপনিষদ সকল প্রাণের উচ্চ আকাঙ্ক্ষামাত্র—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্রাহ্মণদের অত্যাচার—যা কিছু ভারতবর্ষের সার তা বৌদ্ধধর্ম্ম আর জগৎ অলীক—এটা খুব সাহসের কথা বটে তবে প্রলাপ। বেদান্তের মহাবাক্য—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ও যেমন রজ্জু ভ্রমবশত সর্পরূপে প্রতিভাত হয় তেমনি ব্রহ্মই অবিদ্যাপ্রভাবে দ্বৈত-প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাত—এই সার

কথা কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বুঝিয়াছেন কি না—সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ। যে সন্ন্যাস-পারম্পর্য্য ধরিয়া এই অদ্বৈতজ্ঞান চলিয়া আসিতেছে তাহার সঙ্গ না করিলে বেদান্ত-বোধ সুদুর্ল্লভ।

যাঁহারা সমাজদ্রোহী নহেন—প্রতিষ্ঠাবান্ সুধী—তাঁহারা যদি হিন্দু-দর্শন-চিন্তার সমাদর করেন তবে সুফল ফলিবে। কিন্তু এ সফলতা হুড়্‌দুমের কাজ নয়। ইংরেজ সহজে ভেজে না। তুড়ি দিয়ে যে উড়িয়ে দেবে—তা হবেনা। আর আমার মতন সামান্য লোকের দ্বারা ত কিছু হবেই না।

আমার বিশ্বাস যে ভারত জ্ঞানবলে বিশ্ববিজয়ী হইবে। এই বিশ্ববিজয়ী ইংরেজকে অগ্রে জ্ঞানযোগে জয় করিয়া আমাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়া চাই। ইতি। ৯ই জানুয়ারি ১৯০৩।

# বিলাত-প্রবাসী

## সন্ন্যাসীর চিঠি।

( ৫ )

আমি গতবারে লিখিয়াছি যে পঞ্জাবে এখানের চেয়ে শীতের প্রকোপ অধিক। তিন চারি দিন থেকে আর তাহা বলা চলে না। একেবারে হাড়ভাঙ্গা শীত পোড়েছে। গত সপ্তাহে দু তিনদিন বৃষ্টি হয়। সেই জন্য নদী উপ্‌চে উঠায় তটস্থ মাঠগুলি জলময় হোয়েছিল। শীতের চোটে মাঠের জল সব জমে বরফ হোয়ে গেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারধবল ভূমিখণ্ড সূর্য্যকিরণে রঞ্জিত হোয়ে, অপ্সরাদের নর্ত্তন-প্রাঙ্গণের ন্যায় দেখাইতেছে। যথার্থই এখানে নৃত্য হয়। চক্রবিশিষ্ট কাষ্ঠ বা লৌহ-পাদুকার সাহায্যে নরনারী এই বরফের উপর দিয়া রথের মত ঘর্ঘর শব্দে অতিবেগে ছুটিয়া বেড়ায় বা ঘুরপাক খায়। নদী দুটি প্রায় জমে এসেছে। আর দু-এক দিন এই রকম ঠাণ্ডা থাকিলেই চোলে পারাপার হওয়া যাবে। কাল সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে বেড়াতে গিয়াছিলাম। বরফের বড় বড় থান নিয়ে নদীর মাঝখানে ছুড়িয়া ফেলিলাম। সব চুরমার হোয়ে গেল—কেন না মাঝখানেও জল পাথরের মত জমে গেছে। আমার খুব ফুর্ত্তি। শীত বেশ মিঠাকড়া লাগিল। আর আমি একেশ্বর রাজার মত বিহার করিতে করিতে আনন্দে ডুবে গেলাম। একেশ্বর—কেন না ঠাণ্ডায় লোকজন অতি অল্পই সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে বেড়াতে এসেছিল। ইংরেজেরা ভারি শীতকাতুরে। মদ খায় মাংস খায়—তবু হি হি হি করে; আর আগুনের কাছে বসিতে

পারিলে বাঁচে। আমার শীতসহিষ্ণুতা দেখে এরা বিস্মিত হয়। গত কল্য দু জন ইংরেজ থিওসফিষ্টের সঙ্গে খুব আলাপ পরিচয় হইল। আমায় শীতে কাবু করিতে পারে না দেখে একজন আভাস দিলে যে আমার বোধ হয় যোগবল আছে। আমি যদি কথাটাতে সায় দিয়ে একটু গম্ভীর ভাবে যোগমাহাত্ম্য বর্ণন করিতাম তা হোলে খাতিরটা বোধ হয় একটু জমিত। অমনিতেই যথেষ্ট হোয়েছিল তাই আর ভাণ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

গেল সোমবারে এখানকার একজন অধ্যাপক আমায় গাড়ি কোরে বেড়াতে নিয়ে গিয়াছিলেন। আমার মাথায় মলিদার টুপি ও গায়ে পীতবর্ণের বনাত ছিল। রাস্তায় বড় বাহার হোয়েছিল—লোকে হাঁ করে দেখিতে লাগিল। গোটাকতক ছোঁড়া হো হো করে হেঁসেও উঠিল। আর আমি ফর্ ফর্ কোরে ইংরেজি কথা কহিতেছি দেখে মেম সাহেবেরা একবারে অবাক্। এইরূপ ধবলশ্যাম যুগলমূর্ত্তি অশ্বযানে অতি দ্রুতবেগে চলিলাম। দেড় ক্রোশ দূরে লিটল্-মোর নামক এক গ্রামে আমরা উপনীত হইলাম। এই গ্রাম ইংলণ্ডের ইতিহাসে চিরকালই প্রসিদ্ধ থাকিবে। এখানে স্বর্গীয় নিউম্যান বাস করিতেন। ইনি একজন ধর্ম্মবীর। ইংলণ্ডে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিন্তার গতি—বিশ্বাস ও ভক্তির দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। যে গৃহে তিনি বাস করিতেন সেই গৃহে আমরা গেলাম। সেখানে এখন আর একজন অধ্যাপক বাস করেন। ভিতরে গিয়া দেখি যে মল্লিখিত এক ইংরেজি প্রবন্ধ মেজে খোলা রহিয়াছে ও পাতায় পাতায় পেন্সিলের আলোচনা ঘন-সন্নিবিষ্ট। অধ্যাপক আসিয়া উহা সম্ভাষণ করিয়া আমার সহিত মায়া-বাদ সম্বন্ধে আলাপ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমার তখন বেড়াবার সখ চেপেছে। আমি তাঁকে আর একদিন আসিবার অঙ্গীকার করিয়া বিদায় লইলাম। প্রবন্ধে

মায়ার বিষয়ই লেখা ছিল। মায়া কথাটা শুনিলে ইংরেজ চমকিত ও স্তম্ভিত হয়। আমরা দীন হীন জাতি—আমাদের বাঁচা-মরা শালগ্রামের শোয়া-বসার মতন দুই সমান। জগৎকে মায়াময় মিথ্যা বলিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি কিন্তু ইংরেজের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তাই জগৎ মিথ্যা—ইহা একেবারেই মিথ্যা কথা মনে হয়। অনেক মারপেঁচ কোরে বুঝাতে হয়। সহজে তারা ঘাড় পাতে না কিন্তু অবশেষে ঘাড় পাতিতেই হবে। আমাদিগকে পরাজয় কোরে তারা সম্রাট্ হোয়েছে। ঐ সাম্রাজ্য মায়ার ফাঁকি আর কিছুই নয়—এই স্বীকার কোরে একদিন তাহাদিগকে হিন্দুস্থানের পদানত হোতে হবে ও জ্ঞানের জয় ও বলের পরাজয় ঘোষণা করিতে হবে। ইংলণ্ডে অল্পস্বল্প বেদান্তের কথা রটেছে কিন্তু যাঁরা রটান তাঁরা মায়ার বাঁধে এমনি আটকেছেন যে মায়াবাদে আর পঁহুছিতে পারেন না। পুরুষেরা অবিদ্যাকে সদ্বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর অবিদ্যারা পুরুষকে তুচ্ছ করিয়া মাথায় চড়িয়া বসিয়াছেন। কাজেই একটা কিম্ভূত কিমাকার গাউন-পরানো বেদান্ত দাঁড়িয়ে উঠেছে। তবে রক্ষে যে বিলাতি-মার্কা মায়াবাদের বা মায়াসাধের প্রাদুর্ভাব অতি কম। যাহা হউক সেই গ্রাম ছাড়িয়ে আমরা গ্রামান্তরে গেলাম। চাষাভূষা দেখে মনে ধারণা হয় যে ইংরেজেরা আমাদের মতনই মানুষ। সেই চাষ করে মরাই বাঁধে গরু চরায়। তবে চারি কোটি না পাঁচ কোটি লোক ধরা-খানাকে সরা কোরে তুলেছে কেমন কোরে। ঐক্য ও পুরুষকারের জোরে। সমস্ত ইংরেজজাতির মধ্যে একটা বাঁধন আছে—সেটা কিছুতেই ছেঁড়ে না। এত ভয়ানক দলাদলি ও রাগারাগি যে তার সিকির সিকিও আমাদের দেশে নাই। অনেকেই ত রাজমন্ত্রীদিগকে ও গভর্ণমেণ্টকে গাল দিয়া ভূত ভাগায়। কিন্তু বিধিপূর্ব্বক আইন পাস হলেই সব ঠাণ্ডা। অনেকেই প্রতিবাদ করে কিন্তু বিধি কিছুতেই লঙ্ঘন করে না। ইংরেজের

নিজের জাতির উপর ভারি টান বুয়র যুদ্ধে স্বদেশীয়ের রক্তপাত হোয়েছে শুনে গভর্ণমেণ্টের শত্রুরা সব মিত্র হোয়ে গেল আর বুয়র পরাজয়ে এক-প্রাণ হয়ে উঠে পড়ে লাগিল। এই ত গেল একতা। ভাল কোরে পর্য্যবেক্ষণ কোরে দেখলে বুঝা যায় যে ইংরেজের—তা কৃষকই হউক বা বণিকই হউক বা অধ্যাপকই হউক—চোখে মুখে পুরুষকার মাখান। প্রকৃতিকে ব্যবহারক্ষেত্রে জয় করিতে সবাই বদ্ধপরিকর। এইরূপ প্রকৃতি জয়ে বেশ একটা নিষ্কাম ভাব আছে। যদি ইংরেজ মনে করে যে অমুক তারিখে কোন তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ গিরিশিখরে ধ্বজা গাড়িবে—তাহা হইলে সেই দিনে সেই দুরারোহ স্থানে কেশরিচিহ্নিত নিশান পত-পত করিয়া উড়িবেই উড়িবে। উত্তর কেন্দ্রের অপর পারে কি আছে দেখিব—প্রাণ যায় বা থাক্। কত জাহাজ তুষারগর্ভে বিলীন হইল—কত লোক মরিল—তথাপি আবিষ্কার করিবার পণ ভঙ্গ হইবে না। কোন আর্থিক লাভ নাই—কেবল একটা জয়ের আনন্দ—ঈশ্বরত্বের আত্মতুষ্টি—এই জিগীষাকে জ্বালাইয়া রাখে। কিন্তু এই নিষ্কাম ভাব লোপ পাইয়া যাইতেছে। লালসার বহ্নিতে সমগ্র জাতিটা জ্বলিতেছে। আমাদের সংস্কারকেরা ইংরেজের ঈশ্বরত্ব দেখিয়া স্বদেশকে ধিক্কার দেন ও মনে করেন যে কি কুক্ষণে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুর প্রকৃতি-জয়ের কথা বড় একটা বুঝেন না ও বুঝিতে চান না।

হিন্দুর মুখ্য আদর্শ—নিবৃত্তি। প্রকৃতিকে জয় করিয়া নিষ্কাম হওয়া—ঈশ্বরত্ব সম্পন্ন হওয়া—হিন্দুর পরম সাধন। ঈশ্বর হইতে গেলে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে হয়। যাহার প্রয়োজনীয় বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নাই সে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী নহে। কিন্তু যিনি স্বাধিকারের প্রাচুর্য্য ও বাহুল্য-

গুণে প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়াছেন তিনিই প্রভু—তিনিই ঈশ্বর—ঐশ্বর্য্যের স্বামী। রাজা নিজভুজবলে মৃগয়া করিতে সমর্থ—তথাপি অস্ত্রধারী অনুচরেরা তাঁহাকে অনুসরণ করে। অনুচরের তাঁহার প্রয়োজন নাই। তাহারা কেবল বাহুল্যমাত্র। মৃগয়াপক্ষে তাহাদের থাকা না থাকা সমান কথা। রাজার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহারা ঐশ্বর্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে মাত্র। কিন্তু যে ভীরু বা কাপুরুষ শত বা সহস্র রক্ষী বিনা আত্মরক্ষা করিতে পারে না তাহারই অনুচর-বর্গের যথার্থই প্রয়োজন আছে। অনুচরেরা তাহার যেমন দাস সেও তদ্রূপ তাহাদিগের দাস। সে প্রয়োজনের বশগামী। অনুচরবর্গ সত্ত্বেও ঈশ্বরত্ব তাহার নাই।

প্রকৃতিকে ব্যবহার ক্ষেত্রে জয় করিয়া—তাহাকে সেবাদাসী করিয়া কি ফল যদি তাহার সঙ্গ ব্যতিরেকে শান্তিভঙ্গ হয়। এরূপ জয়—জয় নহে কিন্তু পরাজয়—কেবল দাসানুদাসত্ব স্বীকার করা। আমি যদি বিদ্যুৎকে ধরিয়া আনিয়া আমার দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি কিন্তু তাহার ক্ষিপ্র সংবাদ বহন বিনা রাত্রিতে আমার নিদ্রা না হয় তাহা হইলে ধরিতে গিয়া কেবল ধরা পড়া হয় মাত্র। যদি কামানের গোলা বর্ষণ করিয়া নররক্ত পাত করিয়া মরুভূমির গর্ভ হইতে স্বর্ণ আহরণ করি—আর সেই স্বর্ণ লইয়া স্বার্থ্যের সহিত স্বার্থের ঘোর সংঘর্ষ ঘটে—সেই কাঞ্চন লইয়া মারামারি পড়িয়া যায়—সেই হেমপ্রভা—বিচ্যুত হইলে আমার শয্যাকণ্টকী পীড়া হয় তাহা হইলে পুরুষকার আর গোলামিতে কি প্রভেদ।

হিন্দুর প্রকৃতি জয় ওরূপ নহে। প্রকৃতির বিবিধ উপকরণ দিয়া বাসনার নেশার মাত্রাটা চড়ানো হিন্দু স্বভাব-সুলভ নহে। হিন্দু নিঃসঙ্গভাবে প্রকৃতির সহিত ব্যবহার করা অভ্যাস করে। হিন্দুর নিকট তিনিই

নরশ্রেষ্ঠ যিনি ভূমা অনন্ত সর্ব্বময় একত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নামরূপময় বহুত্বের মধ্যে ঈশ্বররূপে বিচরণ করেন। প্রকৃতি তাঁহার সেবা করে বটে কিন্তু প্রকৃতির সম্বন্ধে তিনি বদ্ধ নহেন। তিনি সকল সম্ভোগ সকল ঐশর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া আত্মস্থিত হইয়া বিরাজ করিতে পারেন। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য তাঁহার নিকট কেবল বাহুল্য মাত্র। উহার থাকা না থাকা তাঁহার পক্ষে দুইই সমান। হিন্দু একত্বের ভিতর দিয়া বহুত্বকে দেখে—তাই সম্ভোগবিজড়িত বহুলতার প্রয়োজন তাহার চক্ষে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয়। যেখানে পূর্ণ আত্মস্থিতি সেখানে অনাত্ম বস্তুর প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। নিষ্কাম ঈশ্বরত্ব লাভ হিন্দুর আদর্শ।

আজ হিন্দু জাতি এই উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। তথাপি পূর্ব্ব সাধনার লক্ষণ এখনও বর্ত্তমান। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে প্রকৃতির সঙ্গে অতি অল্পই প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। তাহার আচার-ব্যবহার আদান-প্রদান কঠোর সংযম দ্বারা নিয়মিত। সংসারের ভোগৈশ্বর্য্যকে লাঞ্ছিত করিয়া যেন তাহার দৈনিক কার্য্যের সমাধান হয়। গৃহস্থ ছাড়িয়া নৃপতির প্রাসাদে যাও—দেখিবে ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি—মণি মুক্তা হীরাজহরৎ শালদোশালা কিংখাপে প্রকোষ্ঠ সকল সমাকুল। সেই সকল ধনরত্নবসনভূষণ কিন্তু বাহুল্যরূপে বিরাজিত। রাজা উহাদের অধীন নহেন। সে সকল কখন ব্যবহার করেন কখন বা পরিহার করেন। ঐশ্বর্য্যের আধিক্যে প্রয়োজন কোথায় পলায়ন করিয়াছে। রাজার মহিমা-বর্দ্ধনের জন্যই মণি-মাণিক্যাদির কেবল প্রয়োজন—অভাব পূরণের জন্য নহে। হিন্দুর হয় সম্ভোগসামগ্রীর অল্পতা—শাদাসিধে চালচলন—নয় ত ছড়াছড়ি বাড়াবাড়ি বাহুল্য আড়ম্বর। প্রয়োজনের সুদীর্ঘ পরম্পরায় নিগড় হিন্দুকে বাঁধিয়া রাখে না।

কিন্তু য়ুরোপে ইহার বিপরীত ভাব। য়ুরোপীয় গৃহস্থের ঘরে খুটিনাটি সামগ্রীর আদি অন্ত নাই—সসাগরা পৃথিবী। সেই ক্ষুদ্র নরদেবতাকে যেন করপ্রদান করিয়াছে। কিন্তু সেই সকল সামগ্রী গৃহস্বামীকে প্রয়োজনের রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া রাখে। যা না ব্যবহার করিলেও চলে এমন বস্তু বড় একটা দেখা যায় না। সমস্তই কাজের তালিকায় লেখা। তথায় বাহুল্যের হিসাবে পেটিকায় পুঁজি করিবার অবসর অতি অল্পই আছে। য়ুরোপীয়ের ঘরে দেবাসুর বিজয়ী পঞ্চভূত অশেষ প্রকার রূপ ধরিয়া দাসত্ব করে বটে কিন্তু প্রবৃত্তির কোষাগার হইতে তাহাদের পাওনা গণ্ডা সুদে আসলে আদায় করিয়া লইতে ছাড়ে না। প্রকৃতি যেমন ইংরেজের দাস আসলে সাহেবও তদ্রূপ প্রকৃতির দাস।

ধান ভানিতে শিবের গীত গেয়ে ফেলেছি। ঘণ্টা দুই বেড়িয়ে আমরা সহরে ফিরে এলাম। গ্রামগুলি দেখে কেবল আমার মনে হোতে লাগিল যে এখানে একটা বাঙ্গালীর আড্ডা করিলে মন্দ হয় না। ছাত্রেরা গ্রাম থেকে অনায়াসেই উক্ষপারে পড়িতে আসিতে পারে—কেন না বড় বড় ঘোড়ার গাড়ি সদাই যারায়াত করিতেছে। ব্যবসায়ীরাও থাকিতে পারেন। লণ্ডন ও এখান হইতে বারমিংহাম দেড় ঘণ্টার পথ। একটি ছোট গ্রামের মতন হোলে ইংরেজের মুখামুখি দাঁড়ান যায়। সে দিন একটি ছেলে নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করিতেছিল। গানের সঙ্গে সঙ্গে একর্ডিয়ন বাজাইতেছিল। বোধ হোলো বৈষ্ণবের ছেলে যেন গাহিতেছে। বড় মিষ্টি সুর। আহা—তার নাকে যদি একটি তিলক থাকিত তা হোলে সোনায় সোহাগা হোতো। এখানে শুধু ভিক্ষা করিবার যো নাই। তবে গান গেয়ে বা বাদ্য বাজিয়ে ভিক্ষা করিতে পারা যায়। একজন অন্ধ একটি ছোট মেয়ের হাত ধোরে রাস্তা দিয়ে গাহিতে গাহিতে যায়। পাড়া একবারে মাতিয়ে তুলে। ইংরেজের সুরে

কেমন একটা ধুপ ধাপের ভাব আছে কিন্তু এর গলাটি এমনি মোলায়েম যে একেবারে মুগ্ধ হোয়ে যেতে হয়।

আমার দ্বিতীয় বক্তৃতার পর তৃতীয় বক্তৃতাটি অতি বিলম্বে হইয়াছিল। সভাপতি ডাঃ কেয়ার্ডের সময় ছিল না বলিয়া তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। আর বক্তৃতার সময় ছিল না। কালেজ সব বন্ধ হোয়ে গেল। পাঁচ হপ্তা পরে আবার খুলিবে। তখন বক্তৃতা আরম্ভ করা যাবে। বারমিংহামে বেদান্তসম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছি।

বক্তৃতা ১৫ই ফেব্রুয়ারি হইবে। উক্ষপার ১৬ই জানুয়ারি।

---

# বিলাত-প্রবাসী

## সন্ন্যাসীর চিঠি।

( ৬ )

সত্যি কথা বলিতে কি—বিলিতি সভ্যতার আড়ম্বর আমার একেবারে ভাল লাগে না। প্রকৃতিকে নিয়ে এত ঘাটাঘাটি আমার দুচক্ষের বিষ। হোতে পারে আমার স্বভাব একঘেয়ে হোয়ে গেছে তাই বুঝি মধুও পান্‌সে পান্‌সে লাগে। প্রকৃতিকে একেবারেই ছুঁতে নেই তবে না ছুঁলে চলে না—তাই বিধিনিষেধের অধীন হোয়ে ওষুধ গেলার মত স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এখানে বিধিও নাই নিষেধও নাই—রাস্তা খোলা। আর এড়াবারও জো নেই। প্রকৃতি গায়ে এসে পড়ে। সম্ভোগবহুল সভ্যতার আবর্ত্তে এসে পড়েছি। খুব ঘূরপাক নাকানি চোবানি খাচ্ছি। ঘূরপাকে মজা যে নাই তা বলিতে পারি না। বঙ্গবাসীর পাঠকদিগকে সেই মজাটুকু পাঠিয়ে দিতেছি।

গেল হপ্তায় লণ্ডনে গিয়েছিলাম। ইষ্টিশাণ থেকে ঘোড়ার গাড়ী চোড়ে যাচ্ছি আর হঠাৎ পুলিশ এসে মাঝ রাস্তায় থামিয়ে দিলে। দেখি লোকে লোকারণ্য। ব্যাপার কি না রাজা সেই রাস্তা দিয়ে যাবেন। আমার পাশে একজন ইংরেজ-আরোহীকে বলিলাম যে আমার কপাল ভাল—আজ রাজদর্শন হবে—আমরা বিশ্বাস করি যে রাজদর্শনে পুণ্য হয়। সে বলিল তোমাদের অদ্ভুত ভক্তি। এই রকম বলাবলি কচ্ছি আর ব্রুহামগাড়ি কোরে রাজাধিরাজ ভারতসম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড পাপ-চোখের সামনে এসে উপস্থিত। গাড়ী দ্রুতবেগে চলেছে—কেবল চকিতের

দেখা। কিন্তু তাতেই প্রাণমন পুলকিত হোয়ে গেল। মনে হোলো যেন শক্তিরূপিণী মহামায়া বিজলী হাসি হেসে অন্তর্দ্ধান হয়ে গেলেন। মহা-শক্তি হিমগিরির সিংহত্যাগ কোরে যেন ব্রিটিশসিংহকে বাহনরূপে বরণ করেছেন। মাহেশ্বরীর মায়ার খেলা কে বুঝিতে পারে।

লণ্ডনে আমার একটি ছাত্র আছে। সে এখানে সওদাগরি করে। তার বেশ দুপয়সা রোজগারও হয়। ভারতবর্ষে বারো বৎসর পূর্ব্বে আমার কাছে পোড়ে এনট্রেন্স পাস করেছিল। সে আমায় ভারি খাতির করে। সেই ছাত্র আমাকে ভোজনাদি যথারীতি করায় এবং সকল রকমে যত্ন করে। দক্ষিণহস্তের ব্যাপারটার সুবিধা থাকিলে খুব ফুর্ত্তি হয়। তাই লণ্ডনে খুব ঘুরে বেড়িয়েছি।

লণ্ডনের ভিতর ট্রামগাড়ি নাই। বাহিরে আশে পাশে যেতে গেলে ট্রাম পাওয়া যায়। সহরের মাঝে কেবল অমনিবস্। ইহা এক রকম প্রকাণ্ড গাড়ি। ভিতরে ২২ জন ও ছাদে ২৪ জন বসিতে পারে। বড় বড় দুটা ঘোড়ায় টানে। মাইল করা এক আনা ভাড়া। ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িও বিস্তর। ব্রুহমগাড়িকে আধ খানা কোরে কেটে ফেলিলে যে রকম হয় সেইরকম ইহার আকার। দুটি লোক বসিতে পারে। কোচুয়ান ছাদের পেছন দিকে কোচবাক্সে বসে ও প্রয়োজন হোলে ছাদে একটি ছিদ্র দিয়ে আরোহীর সঙ্গে কথা কয়। ফি মাইলে ৸০ আনা ভাড়া পড়ে। অধিক ।৵০ আনা করে বেশি লাগে। এখানে গাড়িওয়ালাদের সঙ্গে বকাবকি একেবারেই করিতে হয় না। রাস্তা ও বাড়ির নম্বর বোলে চক্ষু বুজে গাড়িতে উঠে পড়ো আর অনতিবিলম্বে নির্ভাবনায় গম্যস্থানে হাজির—যেন কলের খেলা। ভাড়া নিয়ে দরদস্তুর নেই। যা নিরীখ করা আছে তাই দিতে হবে। গৃহস্থ ও সাধারণ লোকে অম্‌নিবসেই চড়ে আর সৌখীন লোকে ভাড়াটে গাড়ি চড়ে।

এই অশ্বযান ছাড়া তিন রকম বাষ্পযান আছে। এক সোজাসুজি রেল-গাড়ি আর এক নীচভুঁই রেল আর তৃতীয় পাতাল গাড়ি। নীচভুঁই রেল বড় কিছু আশ্চর্য্য কারখানা নয়। রাস্তার দশ-বিশ হাত নীচে দিয়ে গাড়ি চলে। মাঝে মাঝে টনেল সুড়ঙ্গ আছে কিন্তু প্রায়ই মাথার দিক খোলা। রাস্তার লোক সাঁকো বা পুলের উপর দিয়ে সেই সব রেলরাস্তা পার হয়। কিন্তু আজব কারখানা সেই পাতাল গাড়ি। এ নামটি আমি রেখেছি। ইংরেজিতে টিউব অর্থাৎ সুড়ঙ্গ রেল বলে। এই পাতাল রেল আন্দাজ ১২ মাইল লম্বা হবে। জমির ৬০ হাত নীচে এক সুড়ঙ্গ কাটা আছে সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে রেলগাড়ি যাতায়াত করে। মাইলে মাইলে ইষ্টিশাণ। দু-আনা ভাড়া—তা এক মাইলই হোক আর দশ মাইলই হোক। ধনী-দরিদ্র বড়—ছোট সব এক শ্রেণী। টিকিট কিনে একটি কাচের বাক্সে ফেলে দিতে হয়। আর একটী লোহার ঘরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। তারপর একজন কর্ম্মচারী এসে কি একটা কল টেপে আর অম্‌নি সুড় সুড় কোরে লোহার ঘরটি নীচে নামে। প্রায় পঞ্চাশ ৫০ হাত নীচে গিয়ে সেই ঘরটি আট্‌কে যায়। তার পর পাথরের সিড়ি দিয়ে বাকি ১০ হাত নেবে প্লাটফরম পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক আলোয় একেবারে কুরখুট্টি। সুড়ঙ্গের এক মুখ থেকে ক্রমাগত কলের দ্বারা হাওয়া চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাই হাঁপ ধরে না। কিন্তু হাওয়াটা যেন—একটু ঘন-ঘন বোধ হয়। দু মিনিট তিন মিনিট অন্তর গাড়ি। গাড়িও একবারে আলোয় ভরা। গাড়ি থেকে নেমে আবার লোহার ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেই সুড় সুড় কোরে উপরে উঠা যায়। ইহাকেই বলে পাতাল গাড়ি। এটা একটা সভ্যতার বাহাদুরি বা ডানপিটেগিরি। পাতাল দিয়ে রেল চালানো কিছু আবশ্যক ছিল না। এজন্য এখানকার লোকে বড় জ্বালাতন হোয়েছে। যাদের

বাড়ীর নীচে দিয়ে সুড়ঙ্গ গেছে তারা রাত্রিতে এক রকম গম্‌গমানি শব্দ শুনিতে পায়—ঘরদোর যেন টল্‌ছে—এইরকম তাদের বোধ হয়। আর যারা সুড়ঙ্গে কাজ করে তাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কখন কখন কোন কোন বাড়ী ধোসে যায় আর রেল-কেম্পানিকে ক্ষতিপূরণ সহিতে হয়। ৬০ হাত নীচে সুড়ঙ্গ কেটে গাড়ি চালান একটা অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে বটে। তবে শেষ রক্ষা হোলেই ভাল। প্রকৃতি সভ্যতার এত অত্যাচার সহ্য করিতে না পেরে শেষে না প্রতিশোধ লয়।

লণ্ডনে আমার চোখে সব চেয়ে সুন্দর জিনিষ একটি হাইড পার্ক—প্রকাণ্ড বাগান। কলিকাতার বিডনষ্ট্রীট সারকুলার রোড্ হ্যারিসন রোড্ ও চিৎপুর রোড দিয়ে যতখানি জায়গা ঘেরা যায় হাইড্ পার্ক ততটা হবে— বেশী ত কম নয়। ইহা বৃক্ষলতাপুষ্পে সুশোভিত ও বড় বড় তৃণাচ্ছাদিত মাঠপূর্ণ—দেখিলে চক্ষু জড়িয়ে যায়। ইহার মধ্যে এক প্রকাণ্ড কৃত্রিম হ্রদ আছে। তাহাতে মরালাদি জলচর পক্ষী সকল ক্রীড়া করে। মাঝে মাঝে আবার মনোহর দ্বীপ। সন্ধ্যার সময় যখন সমস্ত পার্কটা ইলেক্‌ট্রিক আলোকমালায় ভূষিত হয় তখন মনে হয় যেন অমরাবতী ধরাধামে অবতীর্ণা। ইহা প্রণয়িজনের বিহারবন—ভাবুকের চিন্তাভবন —অলসের আরাম—গলাবাজি বক্তৃতার রঙ্গভূমি—চোরছেঁচড়ের আশ্রয় —কর্ম্মক্লিষ্ট কেরাণীর প্রাণ। মনে হয় লোকভারাক্রান্ত লণ্ডন যেন এই স্থান দিয়ে নিশ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে।

লণ্ডনে চুরি-জুয়াচুরি-খুন লেগেই আছে। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক। পৃথিবীর সবজাতি এখানে বর্ত্তমান। তাই সবরকম দুষ্কর্ম্মও মূর্ত্তিমান্। সে দিন একটা বড় মজার চুরি হয়ে গেছে। বড় রাস্তার ধারে এক জহুরীর দোকান। বহুমূল্য আংটি সকল কাচের জানালার ভিতর সাজান রয়েছে। হাজার হাজার লোক সেইখান দিয়ে চলে যাচ্ছে

আর একটা লোক একখান পাথর নিয়ে ধা করে জানালায় মার্‌লে। আংটি সব ছড়িয়ে পড়িল। টপাটপ্ সব কুড়িয়ে নিলে। জুয়াচোরের দলেরা সেইখানে ভিড় কোরে দাঁড়িয়েছিল। তারা কতকগুলা কুড়িয়ে দোকানদারকে দিলে কিন্তু অধিকাংশ পাচার কোরে ফেলিল। যে লোকটা পাথর মেরেছিল সে হৈ হৈ কোরে সরিয়া পালাবার যোগাড় করেছিল কিন্তু পুলিশ ভারি জবর—পাকড়াও করে ফেল্‌লে। চোর কিছু দুঃখিত নয়। ছমাস বা একবৎসর জেল খেটে এসে সে কিছু মেরে দেবে। এক একটা আংটি ১০০০৲ বা ১৫০০৲ টাকা দামের। জহুরী বেচারি একেবারে অবাক্। দিন দুপুরে সদর রাস্তায় চুরি।

আমি একজন বন্ধুর বাড়িতে দিন কয়েকের জন্য অতিথি হোয়ে রয়েছি। সেদিন গৃহিণীর বোন্‌ঝি ও তার সুইটহার্ট মিষ্টপ্রাণ অর্থাৎ প্রণয়ী এসেছিল। তারা দুদিন ছিল। এরা ভদ্র গৃহস্থ। প্রণয়ী বছর পঁচিশের হবে ও প্রণয়িনী বছর কুড়ি। আমি এদের গল্পচ্ছলে আমাদের দেশে স্বামি ও স্ত্রী কিরূপ ব্যবহার করে এবং পরস্পরের ভালবাসা কেমন আড়ালে লুকিয়ে রাখে—তাই বর্ণনা করেছিলাম। কুড়ি বছরের সেই যুবতী আমায় বলিল যে বোধ হয় আমাদের এই প্রণয়ব্যবহার তোমার ভাল লাগে না। বিবাহ-বদ্ধ না হইলেও তারা দুজনে সদাই মুখামুখি কোরে বোসে থাকে আর পরস্পরকে আদর কোরে। মেসো মহাশয় ঠাট্টা করে বল্লেন যে—ও প্রণয় দুদিনের—বিয়ের পর সব জুড়িয়ে যাবে। এ ঠাট্টা যুবতীর সইল না। তাই মেসো মহাশয় আরো চেপে ধরিলেন ও বলিলেন—মনে নেই—তোমার মাসীর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে তুমি আমার সুইটহার্ট ছিলে। বোন্‌ঝি গ্রীবা বাঁকিয়ে বলিল যে ওরকম সুইটহার্ট আমার ঢের ছিল।

কত যুবক আমার প্রণয়ের ভিখারী হয়েছিল। মেসো মহাশয় ছাড়বার পাত্র নন —তিনি জবাব দিলেন —হ্যারি পার্কিন্‌স্‌কে মনে আছে। হাঁ আমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বটে কিন্তু আমার এই বর্ত্তমান স্যুইট্‌হার্ট আমার ঠিক মনের মতন হয়েছে। স্যুইটহার্ট বেচারি বড় কথা টথা কয় না। তিনি প্রণয়িনীর জুতা বুরুস করিয়া দেন—কাপড় টাপড় ঝেড়ে দেন আর কেবল একদৃষ্টিতে সেই প্রণয়িনীর রূপমধু পান করেন। আর এদিকে প্রণয়িনীর মুখে খই ফোটে। আমার গল্প তার বড় ভাল লেগেছিল। অনেকক্ষণ ধোরে আমার কাছে তারা বসে থাকৃত ও গল্প শুন্‌ত। আমিও মিষ্টি মিষ্টি কোরে মধুরে কেমন কোরে মঙ্গলভাব মিশাতে হয় তা আমাদের হিন্দু আচার ব্যবহারের গল্প কোরে বলেছিলাম। অক্ষফোর্ডে এক স্ত্রীলোকদের সভা আছে। আমাকে সেই সভায় হিন্দুগৃহস্থালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে হয়েছিল। এক অধ্যাপকের ঘরণী ভারি বিদুষী—সভাপতি (পত্নি) ছিলেন। মেয়ের পাল সভায় উপস্থিত আর দু দশজন পুরুষও ছিল। আমাদের ছোট মেয়েরা কি রকম পুণ্যপুকুরে যমপুকুরেরর ব্রত করে—গোলাপ টগর পাতায় বলেছিলাম। হিন্দুবিবাহের বিবরণ শুনে তারা ভারি খুসি। ঢেলাভাঙ্গানি শয্যাতোলানী বাসর ঘর ইত্যাদিও বল্‌তে হয়েছিল। ছালনাতলায় বর কানমলা ও কীল খায় শুনে রমণীদের কেবল হো হো হাসি। ঘাটে নাইতে গিয়ে মেয়েরা কি রকম কমিটি করে—শাশুড়ী কেমন কনে-বউকে সায়েস্তা করে স্বামী-স্ত্রী অন্যের সামনে বিশেষ গুরুজনের সমক্ষে দেখাদেখি বা কথা কইতে পারে না—আমরা ভালবেসে বিয়ে করিনি বিয়ে করে ভাল বাসি—এসব কথা বর্ণনা করেছিলাম। শেষ কথা যে আমরা তোমাদের মতন কেবল জুতার ফিতা বেঁধে দিয়ে বা জুতা বুরুষ করে স্ত্রীলোকের সম্মান করি না। কিন্তু আসলে করি।

আমার ভ্রাতৃবধূ যদি বিধবা হয় তাহলে সেই বিধবা ও তাহার পুত্র কন্যাকে আমার ভরণ পোষণ করিতে হয়। সেইরূপ বিধবা ভগিনী ও ভাগিনেয়দিগকে তাহার বসন যোগাইতে হয়। স্ত্রীলোক আমাদের নিকট অবশ্য প্রতিপাল্য। আমরা আমাদের স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করি—এরূপ নিন্দা তোমরা বিশ্বাস করিও না। বক্তৃতার শেষে বড় বড় ঘরের স্ত্রীলোকেরা এসে আমায় বল্লেন যে পাদরি ও জনানা-লেডি-দের মুখে ভারতের নিন্দার কথা আমরা অগ্রাহ্য করিব। একজন সাহেব বল্লেন যে এই রকম বক্তৃতা বিলাতের সহরে সহরে হওয়া উচিত।

ভারতের যাহাতে গৌরব রক্ষা হয় তাই একান্ত বাঞ্ছা।

অক্ষফোর্ড—৬ই মার্চ্চ ১৯০০। বি উপাধ্যায়।

---

# বিলাত-প্রবাসী

## সন্ন্যাসীর চিঠি।

( ৭ )

বসন্তের সমাগম হয়েছে। শীতের প্রকোপ আর নাই। প্রকৃতি আবার নবজীবন পেয়েছে। ছ মাস ধোরে গাছগুলিতে একটিও পাতা ছিল না। উলঙ্গ ঊর্দ্ধ-বাহুর মত দাঁড়িয়েছিল। হটাৎ কে যেন নব কিসলয়-বসন পরিয়ে দিয়েছে। আর অনেক গাছে কেবল ফুল—পাতা এখনও দেখা দেয় নাই। এই ফুলের হাসি দেখে কালিদাসের কথা মনে পড়্ছে।—

কুসুমজন্ম ততোনবপল্লবা
স্তদনু ষট্ পদকোকিলকুজিতম্।
ইতি যথাক্রমমাবিরভূন্মধু
দ্রুমবতীমবতীর্য্য বনস্থলীম্॥

প্রথমে কুসুম-জন্ম তারপর নবপল্লব তারপর ভ্রমর ও কোকিলের কুজন। এইরূপে বসন্ত আবির্ভূত হয়। বিলেতেও সেই কালিদাসের বসন্ত। এখানে পাখীর ডাক এত মিষ্টি লাগে যে মনে হয় যেন কাণে মধু ঢেলে দিচ্ছে। কার্ত্তিক মাস থেকে প্রায় চৈত্র সংক্রান্তি পর্য্যন্ত কিছু সাড়া শব্দ নাই তার পরে একেবারে ঝঙ্কারে চারিদিক পরিপূরিত—তাই বুঝি প্রাণটা এত কেড়ে নেয়। এমন তরু নাই যাতে বিহগ নাই এমন বিহগ নাই—যে কলধ্বনি করে না। এমন কলধ্বনি নাই—যাহা মুগ্ধ করে না। কি কপচান কি সীস—বিরহীর বাঁচা দায়। তবে আমার ভাগ্যগুণে বিরহ-জ্বালা নাই তাই

এখনও বেঁচে আছি। মাঠে ঘাটে এত ফুল যে দেশটা এক প্রকাণ্ড মালঞ্চের আকার ধরেছে। দফাদিল ( daffodil ) কুসুমে মাঠ সব একেবারে বিছিয়ে গেছে। সত্যি সত্যিই দফাদিল—দিল অর্থাৎ মনের দফা রফা। আর করকাশ ( Crocus ) ফুলের রং-বেরঙের ঘটা দেখ্‌লে চোখ ফেরান দায়। প্রেমরোষগুলি ( Primrose ) বাস্তবিক যেন এক একটি অভিমানিনী—রোষভরে চেয়ে রয়েছে। যশোমণি (Jessomini ) ও বোলাটের ( violet ) কথা আর কি বলবো—যে দেখেছে সে মজেছে।

এখানে ছেলে বুড়ো সব একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। মুখে হাসি আর ধরে না। সূর্য্যদেবের অনুগ্রহ খুব হয়েছে। উদয় থেকে অস্ত পর্য্যন্ত চৌদ্দ ঘণ্টাকাল আকাশে অবস্থিতি করেন আর দুঘণ্টা গোধূলি। ষোল ঘণ্টা দিনমান। কিন্তু পৌষ মাসে ছঘণ্টা দিন আর তাও সূর্য্যদেব প্রায় মেঘে বাদলায় ঢাকা থাকেন। বেলা ছটার সময় রৌদ্র দিগ্‌দিগন্ত ফেটে পড়্‌ছে কিন্তু রাস্তায় জনমনুষ্য নাই। সকলের জানালা দরজা বন্ধ। পড়ে ঘুমুচ্চে। এখানে ঘড়ি ধোরে কাজ চলে—বেলা দেখে নয়। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে খাওয়া শোয়া কাজ কর্ম্মের সব এক সময়।

অন্ধকারের পর এত আলো তাই লোকের খুব আনন্দ। এরা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে এত মজে যায় যে ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণও বোধ হয় লুচিমণ্ডা পেয়ে এমন আত্মহারা হয় না। ফুলভরা মাঠে বালক বালিকা যুবক যুবতী সত্যি সত্যি গড়াগড়ি দেয়।

আমি এখানে একটি বক্তৃতায় বলেছিলাম যে ইংরেজের নিকট প্রকৃতি—সম্ভোগের বস্তু বলিয়াই আদৃত হয় তাই তাদের পক্ষে রূপের পূজা বা প্রতীক বা উপাসনা অসম্ভব হিন্দু-সন্তান কি প্রকার রূপের পূজা করে

স্বরূপলাভের জন্য তাহা শুনে ভাল ভাল লোকেরা বলেছিল যে রূপের পূজাকে আর কখনও নিন্দা করিবে না। রূপের দুইটি ভাব—মধুর ও মঙ্গল। মাধর্য্য ও কল্যাণের সমাবেশ স্বরূপের ভূমানন্দ। কিন্তু আমরা প্রবৃত্তি-পরায়ণ হইয়া মধুরকে মঙ্গলভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি ও ব্যবহার করি। যাহার আকর্ষণে মাদকতা জন্মে ইন্দ্রিয় বিলোড়িত হয়—তাহাই মাধুর্য্য। সম্ভোগের আবর্ত্তে মাধুর্য্যই জীবকে টানিয়া আনে। মঙ্গল কিংস্বরূপ। আত্মদানই মঙ্গল। পূর্ণতা যখন উপচিত হইয়া অপরকে ভরপূর করে বাসনাকে সমাহিত করে সম্ভোগের প্রমোদকে বিশুদ্ধানন্দে পরিণত করে তখনই শিব-স্বরূপের দর্শন হয়। সালঙ্কারা নবপরিণীতা বধূর চপলমাধুরী মুগ্ধ করে, প্রিয়জনকে অপর আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু ভূষণ-বিরহিতা আলুলায়িতকেশা কল্যাণময়ী মাতা দান করিতেই ব্যস্ত—আত্মদান ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য নাই। অল্পজলা স্রোতস্বতী কলকল-রবে নাচিতে নাচিতে ধাবিত হয়—মধুরতা যেন দ্রবীভূত হইয়া প্রবাহিত। আর তুষার পরিপুষ্টা আপূর্য্যমাণা ভাগীরথী আত্মসলিল-দানে কত শত প্রবাহকে পূর্ণ করিয়া মাতৃপদে বরণীয়া হইয়াছেন। অনেক ফল ফুল তরু লতা আছে বটে কিন্তু কদলীবৃক্ষ মঙ্গলের পরিচায়ক। কোন অনুষ্ঠানে স্নেহরূপা রম্ভা-তরুর অভাবে—তথায় শত সহস্র নবমল্লিকার সদ্ভাব থাকিলেও—মঙ্গলের যেন অধিষ্ঠান হয় না। কেন—কদলীবৃক্ষের ন্যায় আত্মদ আর কে আছে পূর্ণ—ভোজনপাত্র। সার—আহার সামগ্রী শল্ক—রজকের ব্যবহার্য্য। আর প্রাণবিসর্জ্জন-সমন্বিত ফলদান দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। যতদিন প্রবৃত্তি প্রবল থাকিবে ততদিন রূপের সাধন করিতেই হইবে। অনিত্য রূপকে নিত্যস্বরূপের প্রতিমা বলিয়া গ্রহণ না করিলে প্রবৃত্তি

পরায়ণ মানবের পক্ষে স্বরূপলাভ অসম্ভব। মাধুর্য্যশালী বস্তু প্রতীক হইতে পারে না কেন না তাহা প্রবৃত্তিকে সম্ভোগমুখিনী করে। যাহা মহান্ মঙ্গলময় যাহা আত্মদান করে তাহাই সেই শিবস্বরূপের প্রতিমা বলিয়া স্বীকৃত। গীতাশাস্ত্রে জ্যোতিষ্কের মধ্যে তপন—পাদপের মধ্যে অশ্বত্থ—গিরির মধ্যে হিমালয়—নদীর মধ্যে গঙ্গা বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ—ইত্যাদি বিভূতিমান্ কল্যাণময় বস্তুই প্রতীক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যখন কোন ভক্ত অশ্বত্থের মূলে জলসেক করে তখন ভূমার মঙ্গলভাবই পূত হয়। যখন কুলকামিনীরা পয়স্বিনী গাভীর পরিচর্য্যা করে ভালে সিন্দুর লেপন করিয়া তাহাকে মাতৃপদে বরণ করে তখন অনন্ত করুণাই উপাসিত হয়। যখন ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যদেবকে বেদমন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করেন তখন হিরণ্ময় পুরুষই স্তূত হন। অবিশেষকে জানিতে গেলে —বিশেষ বস্তু বিশেষ স্থান বিশেষ কালকে তাহার বিশেষ অধিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। গঙ্গোত্রি পবিত্র তীর্থ সাধারণ গ্রামে বা নগরে সে পবিত্রতা নাই। গ্রহণের কাল —অন্যান্য কালের অপেক্ষা দান-পূজার অধিকতর উপযোগী। সাধুভক্তগণের আবির্ভাব বা তিরোভাবের তিথি অপরাপর তিথি অপেক্ষা নিশ্চয়ই সম্মানার্হ। অশ্বত্থ অন্য বিটপীর অপেক্ষা পূজ্যতর। গঙ্গা মাতৃস্থানীয়া যে সে নদী নহে। রূপকে এই প্রকার স্বরূপের বিগ্রহ বলিয়া উপাসনা করিতে হয়। রূপকে সাধন-সামগ্রী না করিলে প্রবৃত্তির তাড়না হইতে বাঁচা দায়। ইংরেজেরা প্রকৃতির রূপকে ভালবাসে কিন্তু রূপের সাধন জানে না। নব্য সভ্যতার শাস্ত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে পবিত্রতার বা মঙ্গল ভাবের আরোপ নাই। প্রকৃতির মাধুরী লইয়া কত না গীত—কত না গাথা। কিন্তু যে সকল বস্তু আত্মদ ও কল্যাণময় তাহার আদর নাই। ক্রোটন আর অর্কেরিয়া

লইয়াই ব্যস্ত। অশ্বত্থ বা কদলী বা বিল্বতরুর কোন সম্মান নাই। প্রকৃতি কেবল সম্ভোগের বিষয় হইয়াছে। তাহার মঙ্গলময় রূপ তিরস্কৃত হইয়াছে। আর এদেশে সম্ভোগের ভাব অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিতে মঙ্গলভাব দেখা সুকঠিন ব্যাপার। ছয় সাত মাস স্বভাব যেন একেবারে মৃতপ্রায়। তার পরে সৌন্দর্য্যে ফেটে পড়ে। এতদিন সংযমের পর যদি গোটাকতক দিন আমোদের সময় মাধুর্য্য সম্ভোগ না করা যায় তাহলে জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিবে।

আমার রূপের পূজার ব্যাখ্যা শুনিয়া এক মস্ত অধ্যাপক-পাদরি আমায় লিখিয়াছেন যে রূপসাধনের তত্ত্ব অতি গম্ভীর ও মনোহর। এ্যরা অনেকে মনে করেন যে যদি ইংরেজিশিক্ষার প্রভাবে এই হিন্দুভাব নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে জগতের ঘোর অতিষ্ট হইবে।

হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা করি। আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে বর্ণধর্ম্মই হিন্দু জাতিকে চিরজীবী করিয়াছে। কত জাতি লোপ পাইয়াছে কিন্তু হিন্দু এখনও বর্ত্তমান। হিন্দু যেরূপ ঝড় তুফান বিপ্লব সহিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত আর ইতিহাসে নাই। ইংরেজের একতা রাজনীতির উপর নির্ভর করে। আমি এদের বলিয়াছি যে আগে দেখাও যে রাজনৈতিক একতা এত ঝড় তুফান সহিতে পারে তবে আমাদের শিক্ষকতা করিতে আসিও। মিছামিছি বর্ণধর্ম্মের নিন্দা করিও না।

আর বক্তৃতার ফল এই হয়েছে যে জন কয়েক অধ্যাপক এক কমিটি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন —যাহাতে অক্ষফোর্ডে হিন্দু দর্শনের শিক্ষা হয়। এই সদুদ্দেশ্যের সফলতা অর্থের উপর নির্ভর করে। তাই বিধাতার মুখপানে চেয়ে চুপ করে আছি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার হাবভাব যত বুঝিতেছি তত আমাদের দেশের

সংস্কারকদের উপর আমার রাগ বাড়িতেছে। সভ্যতার যে ভাল দিক্ আছে তাহা ঢের বুঝান হইয়াছে। তবে আমরা গুণই জেনেছি গুণাগুণ ভাল করে বুঝিনি। শুন্‌লে বিস্মিত হতে হয় যে এখানে শতকরা চল্লিশ জন বিবাহ করিতে পারে না। গরীব ভদ্রগৃহস্থের বিবাহ করা দায়। যদি' তাহারা সমান ঘরে বিবাহ করে তাহলে সমাজে গৃহিণীর মর্য্যাদা রাখিতে গিয়া গাউনের খরচাতেই প্রাণ অন্ত —একেবারে ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন। আর যদি নীচু ঘরে বিবাহ করে তাহলে একঘরে হতে হয় —নিজর সমাজে নিমন্ত্রণাদি বন্ধ হয়। এই সভ্যতার তত্ত্বটি আমি অতি অন্তরঙ্গ ভাবে জানিয়াছি বাহির থেকে বড় একটা জানা যায় না। অর্থাভাবে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ রহিত হয়ে প্রবৃত্তির যদৃচ্ছাচারিতা ক্রমশই বাড়িতেছে।

এখানে বিপুল ঐশ্বর্য্য কিন্তু দরিদ্রতাও খুব। শতকরা ত্রিশ জন দরিদ্র অর্থাৎ কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জন করে। তার মধ্যেও আবার অনেকে তাও পারে না।

শুন্‌লে বিশ্বাস হয় না যে এখানকার অধিকাংশ শ্রমজীবীরা মাংস খেতে পায় না। মদিরাটুকু ( beer ) চাইই-চাই কিন্তু মাংস কিনিবার পয়সা তাদের জুটে উঠে না। কেবল রবিবার দিন মাংস খায়—আর অন্য দিন রুটি পনীর আলু ইত্যাদি খায়। এক দিকে যেমন অর্থ বাড়িতেছে অপর দিকে তেমনি অভাব বাড়িতেছে। প্রতিযোগিতা যে সভ্যতার মূল তাহার ফল এইরূপ হইবেই হইবে। এখানে কলেতে ( factory ) অপরিণীতা স্ত্রীলোক সকল কাজ করে। তারা যে রোজগার করে তাতে তাদের কিছুতেই চলে না। তাই তারা প্রায় সকলে পেটের দায়ে দুশ্চরিত্রা হয় এ একেবারে জানা কথা। তবুও এমনি প্রতিযোগিতার ( Competition ) চাপ যে তাদের পাওনা বাড়ান বড়ই মুস্কিল।

অর্থ যে কি অনর্থ ঘটিয়েছে তা বর্ণনা করা যায় না। যদি বড় মানুষ হয় তাহলে তার ছেলে মেয়ের বিবাহোপলক্ষে খানা ও মজলিসে গরিব পিতামাতার ভাইভগ্নীর নিমন্ত্রণ হবার জো নাই। ভ্রাতৃভাবাপন্ন সংস্কারকেরা এই সভ্যতার ফলটি একটু তলিয়ে যেন দেখেন। তাহোলে তাঁদের জাতিভেদের উপর বিদ্বেষ ঘুচে যেতে পারে।

আর একটা কথা বলি। স্বাধীন প্রেমে বড় একটা বিভ্রাট ঘটেছে। পণ-ভঙ্গের (Breach of Promise) মোকদ্দমার কিছু বাড়বাড়ি হয়েছে। কোন যুবক যদি কোন যুবতীকে বাগ্‌দান কোরে বিবাহ না করে তা হোলে খেসারৎ নালীস চলে। এই রকম নালিস অনেক হচ্ছে বোলে হাকিমেরা দণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেদিন এক গরীব যুবকের পণভঙ্গের দরুণ ৭৫০০৲ টাকা দণ্ড হয়েছে অর্থাৎ যুবতী এই টাকাটা যতদিনে পারে কিস্তিবন্দি কোরে আদায় করে নিতে পারবে। কিস্তি-বন্দিটা অবশ্য আয় অনুসারে হবে। যুবতীরা যত প্রেমপত্র—সব নম্বর ডকেট (docket) ও ফাইল কোরে রাখতে আরম্ভ করেছে—কি জানি যদি প্রণয়িণীর নামে নালিস করিতে হয়। তারাও গ্রিমেণ্ট (Agreement) লিখিয়ে নিতে আরম্ভ করেছে। সেদিন কোর্টে পণ-ভঙ্গের মোকদ্দমায় এক গ্রিমেণ্ট দাখিল হয়েছিল। তার মর্ম্ম এইরূপ —আমার প্রণয়ী (ভাবি স্বামী) আমাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসে—তা আমি জানি কিন্তু যদি কোন আকস্মিক কারণে আমায় বিবাহ করে তাহলে আমি ১৫০৲ টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হইব আর সব প্রেম-পত্র (Love-letters) ফিরাইয়া দিব। এই গ্রিমেণ্টের জোরে যুবক ১৫০ টাকাতেই রেহাই পেয়েছিল। প্রেমেও ব্যবসাদারি—বাহবা সভ্যতা।

ডাকের আর সময় নাই—আজ এই পর্য্যন্ত।

অক্ষফোর্ড—২৪শে এপ্রিল ১৯০৩। বি উপাধ্যায়।

# বিলাত-প্রবাসী

## সন্ন্যাসীর চিঠি।

( ৮ )

এখানে এখন রাত নয়টা পর্য্যন্ত গোধূলি থাকে। আবার ওদিকে রাত তিনটের সময় বেশ ফর্‌সা হয়। ঠিক ধর্‌তে গেলে ঘণ্টা চারি-পাঁচ রাত থাকে। সূর্য্যের কিরণকে রৌদ্র বলে—কিন্তু এখানে একেবারে রুদ্রভাব নেই। দা-কাটা কড়া তানাকে আর বাবু মহলের ভ্যালসায় যত তফাৎ আমাদের দেশের এবং এখানকার রোদে তত তফাৎ। তবে বেলা দুটা-তিনটার সময় একটু মিটে কড়া রকম হয়। সেই সময় গাছের তলায় বড় আরাম। হাওয়া যে কত মিষ্টি লাগে তা বলে উঠা দায়।

এখানে গ্রীষ্মে হাওয়া খাওয়া আর মধু খাওয়া দুই এক। কালেজের ছাত্রদের খুব নৌকা-বহার ধূম পড়ে গেছে। অধ্যাপকদের কন্যারা এবং সহরবাসী গৃহস্থের মেয়েরা সব অপরাহ্ণে নদীর ধারে বেড়াতে আসে। যুবক ছাত্রেরা এবং ঐ যুবতীরা নৌকারোহণ কোরে কখন বা ধীরি ধীরি কখন বা দ্রুতগতি দূরে দূরে ভেসে চলে যায়। কেহ কেহ আবার কোন তীর তরুচ্ছায়ায় তরীটিকে বেঁধে অলসতার মাধুর্য্য সম্ভোগ করে। তবে একটা কড়া নিয়ম আছে। ছাত্রেরা বড় ঘরের বা মধ্যবিৎ গৃহস্থের মেয়েদের সঙ্গে মিশিতে পারে কিন্তু যে মেয়েরা দোকানে কাজ করে নীচ ঘরের—তাদের সঙ্গে রাস্তায় কথাটি পর্য্যন্ত কহিলে ছাত্রটী শাস্তি পায়। সন্ধ্যার পর ছয় সাত জন দারোগা ( proctor ) ঘুরে বেড়ান।

এক এক জন দারোগার সঙ্গে দুজন কোরে ষণ্ডামার্ক লোক থাকে। তাদের ছেলেরা নাম রেখেছে ডালকুত্তো (Bull-dog)। যদি কোন ছেলে ঐ রকম নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে কথা কয় বা বেড়াতে যায় তা হোলে দারোগা তার নাম ও কোন কালেজের ছাত্র তা লিখে নেয়। অনেক ছেলে পালাতে চেষ্টা করে ও অলিগলি ঘেসে দৌড় দেয়। ডালকুত্তোরা অমনি পেছু পেছু ছোটে ও গ্রেপ্তার করে আনে। দারোগা রিপোর্ট কোল্লে ছেলেদের খুব সাজা হয়। তবে ছেলেরা খুব তৈয়ের। দারোগাকে ফাঁকি দিতে বেশ জানে।

আমার নিজের কথা বড় একটা বঙ্গবাসীতে লিখিনি। লিখিলেই মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এখানে কতকগুলা ভূতুড়ে বা ভূতের গল্প-প্রিয় লোক আছে। তারা মনে করে যে হিন্দু হোলে পরের মন জানতে পারা যায় দেওয়ালের ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় প্রেতসিদ্ধ হওয়া যায়। জাত ইংরেজ কি না তাই কেবল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের দিকে নজর—ভক্তি বা অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হবে এ সব কথা মাথায় যায় না। এরা আমায় পাকড়াও করেছিল। বক্তৃতার উপর বক্তৃতা। ভারি হৈ চৈ পোড়ে গিয়েছিল। যদি কাগজে সে সব লিখি বা লেখাই তা হোলে ধারণা হবে যে কি একটা ব্যাপার হয়েছে। কিন্তু সত্যের অপলাপ একটুও হবে না—যদি বলা যায় যে এরা অতি অকর্ম্মণ্য লোক। আবার এদের মধ্যে মেয়ে মানুষই ঢের। ভারতের যে কি দুর্দ্দশা তা বলা যায় না। যত মেয়ে তেড়ে ফুড়ে ভারতের দর্শনতত্ত্ব শিখতে আসে। শুধু শিখ্‌তে আসে তা নয় আচার্য্য হোতে চায়। এই সব মেয়েরা আমায় ধরেছিল। লণ্ডনে এক মস্ত সৌখীন লোকদের আড্ডায় (Sesame club) আমায় নিয়ে গিয়ে খানা দিয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখি যে সৌখীন মেয়েরা সন্ধ্যাবেলার পোষাক পোরে এসেছে। সন্ধ্যার

পোষাক মানে—অর্দ্ধেক বুক ও হাত খোলা। আমার ত দেখেই আক্কেল গুড়ুম। কোন রকমে কপি ও আলু-সিদ্ধ (বিলাতে আমার ঐ ভরসা) খেয়ে চম্পট দিলাম। মিষ্টর ষ্টর্ডি বোলে একজন আছেন তিনি খুব হিন্দুস্থান ভক্ত। তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন যাতে হিন্দুর দর্শন জ্ঞান চলে কিন্তু বিফল মনোরথ হয়েছেন। তিনিও বলেন কতকগুলি মেয়ে মানুষ ছাড়া আর কেউ বড় মনোযোগ দেয় না। তিনি তাই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। কিসে এখানকার বিদ্বানেরা বেদান্ত দর্শনের আস্বাদন পায় তার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টিত হওয়া উচিত। অক্ষফোর্ড ও কেমব্রিজ সরস্বতীর দুটী পাশ্চাত্য পীঠস্থান। কিন্তু এখানকার কোন দার্শনিক অধ্যাপক হিন্দুদর্শনের বিষয় কিছুই জানেন না। যা বা জানেন তা সব বিপরীত। ডাক্তার কোয়ার্ড প্রভৃতি দর্শনিকেরা তাঁদের গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন যে বেদান্ত এক পুরাণ কালের দর্শন—এখনকার বিদ্যার কাছে তাহা আর খাটে না। এ সব দার্শনিকদের কাছে মোক্ষমুলর প্রভৃতি ভাষা-তত্ত্ববিৎ দাঁড়াইতে পারেন না। এদের কথা সকলেই গ্রাহ্য করে। অক্ষফোর্ডে আমি অল্পস্বল্প চেষ্টা করেছি তাহার আভাস আগেই দিয়েছি। অল্পদিন হোল কামব্রিজে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। ত্রিনীতি কালেজে তিনটি বক্তৃতা করি। বিষয়—(১) হিন্দুর নির্গুণ ব্রহ্ম (২) হিন্দুর ধর্ম্মনীতি (৩) হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব। প্রসিদ্ধ দার্শনিক) Dr.Metaggarp) সভাপতি ছিলেন। নিজের সুখ্যাত করতে নেই বক্তৃতা তিনটি খুব জমেছিল। অনেক অধ্যাপক ও ছাত্র উপস্থিত ছিল। বক্তৃতার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে অধ্যাপকেরা পরামর্শ করছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে বেদান্তদর্শন শিক্ষা দেওয়া যাবে কিনা। যদি সুপরামর্শ হয় তা হোলেই মঙ্গলনহিলে আবার উঠে পড়ে লাগ্‌তে হবে। এক দিনের কর্ম্ম

নয় এক জনেরও কর্ম্ম নয়। ইংরেজের ছেলেরা বেদান্ত পড়লে য়ুরোপেরও মঙ্গল ও ভারতের মঙ্গল। এরাঁইত গিয়ে আমাদের অধ্যাপক ও হাকিমহন।

বক্তৃতা দিয়ে খুব নিমন্ত্রণ খাওয়া গিয়েছিল। এক জনেরা আমায় বেশ কোরে ফলাহার করিয়ে ১০৫৲ টাকা দক্ষিণা দিয়েছে। আমি একেবারে অবাক্। এখানের দস্তুর বক্তৃতার জন্যে টিকিট করা। কিন্তু আমি টিকিট করি নে কেন না তত্ত্বজ্ঞান বিক্রি করিতে রুচি হয় না। তাই বড় খরচের টানাটানি হয়। কাপড় চোপড়ও ছিড়ে গিয়েছিল—নূতন কর্‌তে গেলে অনেক খরচ। একটা লম্বা গরম জামা কর্‌তে ৪০ টাকার কম হয় না। ভগবান্ জুটিয়ে দিলেন। এখন একটু আরাম করে বেড়াতে পার্‌বো।

কামব্রিজে ষাট সত্তর জন ভারতীয় ছাত্র আছে তার মধ্যে বাঙ্গালী জন দশেক। আমাদও দুটি ছাত্র এখানে পড়ে। একজন নিজে হাতে পায়স ও মোহনভোগ তৈয়ারী করে খাইয়েছিল। অতি উপাদেয়। বিলেতে বসে পায়স ও মোহনভোগ খাওয়া রাজার কপালেও ঘোটে ওঠে না। বাঙ্গালী ছাত্রেরা তাদের মেম-রাঁধুনীকে বাঙ্গালা তরকারী কর্‌তে শিখিয়েছে। ডাল-ভাত-তরকারী খেয়ে ধড়ে প্রাণ এসেছে। আর একজন হিন্দুস্থানী ছাত্র দেশ থেকে আমের আচার এনেছিল তাই খেয়ে জিভ্‌টার সাড় হোয়েছে। বোধ হয় আচারের জোরেই বক্তৃতাগুলা ভাল হয়েদিল।

কতকগুলি পাদরী আমাদের দেশের ভয়ানক শত্রু তারা ছুটি নিয়ে আসে আর এখানে এসে আমাদের নিন্দা করে। এক ভয়ানক নিন্দা যে আমরা আমাদের স্ত্রীলোকের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করি। কামব্রিজে একজন পাদরী ঐ রকম খুব কুৎসা কোরেছে। দেশী-ছাত্রেরা লজ্জায়

ও ক্রোধে অভিভূত হয়েছিল। তারা ছাত্র তাদের কথায় বড় কেহ শোনে না। আমি আসাতে সেখানকার মেয়েরা আমাকে দিয়ে বক্তৃতা করিয়েছিল। তাদের বড় জান্‌তে ইচ্ছে আমরা স্ত্রীলোকদের প্রতিকিরূপ আচরণ করি। অনেক কথা তাদের বলেছিলাম। দুই একটা বিষয় লিখছি।

আমি তাদের বলেছিলাম যে তোমাদের পুরুষেরা কেবল তোমাদের জুতো ঝেড়ে দিয়ে সম্মান করে কিন্তু কাজের বেলা সব ফাঁকি। আর আমরা স্ত্রীলোকদের জুতা সাফ করিনে বটে কিন্তু যথাসাধ্য ভরণযোষণ কোরে সম্মান করি। আমার বিধবা ভ্রাতৃজায়া যা ভগিনী ও তাদের পুত্রকন্যাদিগকে যদি আমি প্রতিপালন না করি তা হোলে আমি সমাজে একজন অতি অধম লোক বোলে গণিত হব। বিবাহকালে কন্যার পিতা কিছু না কিছু অলঙ্কার বা অর্থ দিতে বাধ্য। সেই অলঙ্কার স্ত্রীধনরূপে গ্রাহ্য। তাহাতে স্বামীর বা পুত্রের কোন অধিকার নাই। যাহাকে ইচ্ছা সেই স্ত্রীধন আমাদের মেয়েরা দিয়া যাইতে পারে। যদি কাহাকেও দত্ত না হয় তা হোলে কন্যারা সেই স্ত্রীধনের অধিকারিণী হয়। তোমাদের স্ত্রীলোকদের এরূপ ক্ষমতা দশ বৎসর আগে ছিল না। আর আমাদের স্ত্রীলোকদের ক্ষমতা গৃহস্থালী ব্যাপারে এক প্রকার অসীম। তোমাদের দেশে বিধবা মা-বোন গতর খাটিয়ে খায় আর পুত্র এবং ভ্রাতা গাড়ি হাঁকিয়ে হাওয়া খেয়ে জুড়ি চড়ে। বিবাহ সম্বন্ধে স্বাধীনতা বড় শুভফলপ্রদ নহে। তোমরা মনে কর যে পরিণয় এক চির-মধুযামিনী (perpetual honey-moon) সম্ভোগের ব্যাপার আর উদ্দামপ্রবৃত্তি যুবকযুবতীরা ভোগবাসনা নিরত হইয়াই প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হয়। শতকরা একজনও মঙ্গলভাব-প্রণোজিত হইয়া উদ্বাহবন্ধন স্বীকার করে না তাই তোমাদের সমাজে এত শিথিলতা দাঁড়াইতেছে। বিবাহের মাধুর্য্য

পুরাণ ওপান্‌সে হয়ে যায় অমনি চঞ্চলতা এসে গৃহের মঙ্গল লক্ষ্মীকে দূর করে দেয়। হিন্দুর আদর্শ ভিন্ন। হিন্দু পিতৃঋণ-পরিশোধার্থে বিবাহ করে। তাহাদের বিবাহ সম্ভোগের জন্য নয়। পিতৃত্ব ও মাতৃত্বরূপ মঙ্গলভাব করণের জন্য। হিন্দু তাই চঞ্চলস্বভাব যুবক যুবতীর হাতে পরিণয়ের গুরুভাব দেয় না। পিতা মাতাই ভাল কুলশীল দেখে পাত্রপাত্রী স্থির করে। কতকগুলি পাদ্‌রী গূঢ় কথা বুঝতে পারে না তাই মিথ্যা মিথ্যা আমাদের নিন্দা করে। এই বক্তৃতার পর কামব্রিজ সহরে খুব একটা গোল হয়ে গেছে। আমার কালেজেতে বক্তৃতার দিন এক পাদরী কি আমাদের দেশের বিরুদ্ধে বল্‌তে উঠেছিল অম্‌নি সভা-পতি তাকে দুই ধমক দিলেন আর শ্রোতৃবর্গের হাততালির চোটে তাকে একেবারে দাঁড়িয়ে মাটি করে দিলে।

এখানে মেয়েদের বড় কষ্ট। চেহারা ভাল না হোলে বিয়ে হয় না। বাজের টাকা থাক্‌লে সুবিধে হোতে পারে কিন্তু বড়ই মুস্কিল। যদি টিপ্‌কপালী বা চিরুণ দাঁতী হয় তা হোলে কেউ তাদের গ্রাহ্য করে না। যুবতী প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা কুমারীর দল এত বেশী যে পায়ে ঠেকে। বিলেতে মেয়ের সংখ্যা অধিক শতকরা ৬০। এই অবিবাহিতা মেয়েদের অধিকাংশকে খেটে খেতে হয়। গৃহস্থের মেয়েরা তাই লেখাপড়া শেখে ও মেয়ে স্কুলে ডাকঘরে তার-ঘরে দোকানে ও অন্যান্য জায়গায় চাকরি পায়।

কিছু দিন আগে অক্ষফোর্ডে ও কামব্রিজে মেয়েদের পড়িতে দিত না। এখন পড়িতে দেয় কিন্তু উপাধি B. A, M.A, Degree দেয় না। একজন বিদুষি-স্ত্রীলোক এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের নিন্দা করছিলেন। আমি তাঁকে বল্‌লাম যে ঘরে একেত তোমাদের শাসনে পুরুষ অস্থির আকার উসাধিধারিণী ফেলো হোলে সেনেট সিন্‌ডিকেটে

পুরুষদের উস্তম্ ফুস্তম্ করবে। এতটা সহায় যায় না। এই কথা বলাতেই একেবারে খুব হাসি। সেখানে অরো অনেক অধ্যাপিকা ছিলেন। এরা আমার বক্তৃতা শুনে তাঁদের মেয়ে-কলেজ দেখাতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে খুব খাতির করেছিলেন। তাই সাহস কোরে দুটো কথা শুনিয়ে দিতে পেরেছিলাম। এখন আর আমার বক্তৃতার গোল নাই। বঙ্গবাসীতে নিয়মমতচিঠি লিখ্‌তে চেষ্টা করবো। ইতি ৫ই মে ১৯০৩। বি উপাধ্যায়।

# বিলাত-প্রবাসী

## সন্ন্যাসীর চিঠি।

(৯)

আমি অক্ষফোর্ডে যে গৃহস্থের বাড়িতে থাকি তারা সামান্য রকম লোক কিন্তু ভদ্র। কর্ত্তা প্রায় এক শত টাকা মাসিক রোজগার করেন—অর্থাৎ আমাদের দেশের ২৫।৩০ টাকার কেরাণীর মত অবস্থাপন্ন। গৃহিণী সুশিক্ষিতা—বিবাহের পূর্ব্বে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। তিনটি কন্যা ও একটি পুত্র। বড় মেয়েটি এক ফারমে কেরাণীর কাজ করে। আমাকে এরা সকলেই খুব খাতির যত্ন করে। আমি একটি বড় ঘরে থাকি। ঘরটি ফুলদার রঙীন কাগজে মোড়া। মেজে কারপেট বিছান। একটি সোফা ( Sofa ) ইজিচেয়ার ( Easy chair ) তিন খানি গদি-মোড়া কেদারা তিনটি ত্রিপাই ( Tripoy ) ও একটা বড় মেজ। দেওয়ালে খান বারো নানা রকমের ছবি সাজানো আছে। আর এক খানা গিল্‌টির কাজ-করা ফেরেম-দেওয়া বড় আর্‌সি আছে তাতে উঠতে বসতে আমার চাঁদমুখ দেখতে পাই। আহা যদি নিজেকে ভালবাসতাম তা হোলে কি আনন্দই না হোত। কিন্তু আমার কপাল এমনি মন্দ যে যাদের সঙ্গে আমার ভারি ঘনিষ্ঠতা তারা প্রায় সকলেই আমার চেয়ে সুশ্রী—নয় গুণবান্। তাই ছেলেবেলা থেকে নিজের উপর বড় ভাব-ভক্তি হয় না। তবে চেহারা যে একেবারে মন্দ তা নয় কিন্তু ভালবাসার যুগ্যি নয়। যাক্ নিজের কথা। ঘরটিতে দুটি জানালা। তাতে নেটের ফুলকরা পরদা টাঙ্গান। স্প্রিঙ্গের একখানি খাট বেশ

গদিপাতা। দেশে কম্বলে মাদুরে শুয়ে বৈরাগ্য সাধন করিতাম। এখানে বৈরাগ্য টৈরাগ্য কোথায় ভেসে গেছে। প্রাতে উঠে মুখ হাত ধুয়েই খাওয়া। দু পেয়ালা চা—চারি টুকরা রুটী একতাল মাখন ও এক পেলেট পরিজ (Porridge) অর্থাৎ সিদ্ধকরা কোন শস্য—আমি রোজ বেলা ৮৷৷টার সময় উদরসাৎ করি। ইহাকে উপবাস-ভঞ্জন break-fast বলে। তার পর বেলা একটার সময় লাঞ্চ (lunch) অর্থাৎ মধ্যাহ্নের আহার। ভাত ডাল আলু ভাজা কপির তরকারী রুটী মাখন ও ফল ইত্যাদি খাই। আবার চারিটার সময় টোষ্ট অর্থাৎ রুটী মাখমে ভাজা—কেক আর দু পেয়ালা চা অবাধে গ্রহণ করি। রাত্রি আটটার সময় ডিনার (Dinner) অর্থাৎ প্রধান আহার। আমি প্রায়ই আলু বরবটি ও কলাই শুঁটির তরকারী রুটী ও পুডিং (Pudding) খাই। এখনও শেষ হয় নি। শোবার আগে এক পেয়ালা গরম দুগ্ধ পান করি। দেশে যদি এত খাই তা হোলে দু চার দিনেই শমন-ভবন গমন করিতে হয়। তবু আমি এখানে একজন মস্ত সাধু। মাছ মাংস ডিম কিছু খাই না—কি কোরে বাঁচি তাই সবাই অবাক্। এখানকার নিরামিষাশীরা (Vegetarian) ডিম খায় কেননা ডিমের কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু এখানে যেমন খাওয়া তেমনি পরিশ্রম করা চাই। ছ সাত মাইল অন্ততঃ রোজ না বেড়ালে অসুখ করে। আমার শরীর বেশ শুধরে গেছে। চেহারা লাল হোয়ে উঠেছে। কিন্তু মাসে ৫০টি করে টাকা দিতে হয়। এর চেয়ে সস্তা হয় না। গৃহিণী মাঝে মাঝে মিষ্টান্ন করেও খাওয়ান। আর ডিম খাইনে বোলে প্রায়ই ডিম না দিয়ে কেক্ তৈয়ারী করেন। কাপড় চোপড় নিজেই কেচে দেন ধোপার খরচ লাগে না। বাড়িতে ইস্ত্রি করিবার বন্দোবস্ত আছে। ইজের মোজা ছিঁড়ে গেলে খুব ভাল রকম নিজে রিপু কোরে দেন। গৃহিণী

বড় পরিশ্রমী। দাসী নাই। সমস্ত দিন রান্না ও ঘরকন্নার কাজ তাঁহাকে করিতে হয়। আমার উপর এঁর কিছু ভক্তি হয়েছে। এক এক দিন সময় হোলে আমার কাছে এসে ধর্ম্মোপদেশ নেন। সংসারের ভাবনার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি কি প্রকারে মিশাইতে হয় তাহা আমি একে বলি। তাই অনেকটা গুরুর মতন সেবা পাই। ছোট ছোট মেয়েগুলি সদাই ব্যস্ত পাছে আমার খাবার দাবারের কোন ত্রুটি হয়। বড় মেয়েটি একদিন আমার খাবার দিতে এসে তার কাঁধের উপর দিয়ে একটু নুন ছড়িয়ে দিলে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি। সে বল্‌লে যে আস্‌তে আস্‌তে নুন ফেলে দিয়েছিল। নুন ফেলা বড় অলক্ষণ। তাই ঐরকম কোরে অলক্ষণের কাটান করিতে হয়। আমাদের দেশেও অনেক স্থানে এই রকম প্রথা আছে—যেমন তেল পড়ে গেলে সেই জায়গায় একটু জলের ছিটে দিতে হয়। এখানে ঐপ্রকার অনেক সরল প্রথা আছে। সভ্যতার প্রকোপে আমাদের দেশে ভারতবর্ষে কত না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার ব্যবহারকে কুসংস্কার বোলে উড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে। সভ্যতার দেশেই কিন্তু কুসংস্কার বেশী। গৃহিণীর এক ভগ্নী তার মামাতো ভাইকে বিয়ে করিবে বোলে ক্ষেপেছে। মামা ভয়ানক চটেছেন। ছেলেকে বিষয় দেবে না বোলে ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রণয়ি-যুগল অটল। তাই গৃহিণী দুঃখ কোরে আমায় বাল্‌ছিলেন যে মামাতো পিস্‌তুতো ভাই বোনে বিয়ে বড় মন্দ। একটা ইংরেজিতে ছড়া বলিলেন —সেটা আমি ভুলে গেছি। তার অর্থ এই যে ঐ প্রকার বিয়েতে স্বাস্থ্য ও অর্থনাশ হয় আর বন্ধ্যাদোষ হয়। বল্‌লেন—যতগুলা আমি দেখেছি ততগুলা ঐরকম। তার সাক্ষী আমাদের পাড়াতেই এক ঘর বুড়ো বুড়ী স্বামী স্ত্রী আছে। তারা খুড়তুতো ভাই বোন। তাদের সব টাকাও ব্যবসায় নষ্ট হোয়েছে—ছেলে পিলে হয় নাই আর তারা রোগে জীর্ণ।

এত দেখে-শুনেও তাঁর বোনের কেন এমন কুমতি হোলো তাই বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

আমরা সকলেই জানি যে ইংরেজের প্রাণ অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু নির্ভরটা কত দূর তা বোধ হয় অনেকেই জানে না। বিলেতে প্রতি বৎসর প্রায় ছয় কোটি মণ গম আমদানি হয়। মার্কিণ মুলুক হোতে তিন কোটি মণ আসে। কানেডা হোতে পঁয়েষট্টি লাখ মণ ও হিন্দুস্থান হোতে ষাট লাখ মণ গম আসে। বাকি অন্যান্য দেশ যোগায়। গম ছাড়া ময়দা ১ কোটি ৮০ লাখ মণ। যবও প্রায় অত। জুয়ারি ( Maize ) তিন কোটি মণ। ভেড়ার মাংস দেড় কোটি মণ ও ১০ লাখ মণ শূকরের মাংস বিদেশ থেকে আসে।

তাই ইংরেজের ব্যবসাগত প্রাণ।

মিষ্টার চেম্বারলেন এখানে এক ভারি গোল বাধিয়েছেন। তিনি এক বক্তৃতায় বলেন যে উপনিবেশের আমদানি মালের উপর মাশুল কম কোরে অন্য দেশের মালের উপর মাশুল বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। উপনিবেশ সকল আমাদের পরিবারভুক্ত তজ্জন্য তাদের মাল ত দেশের মাল এক মনে করা উচিত। আর তা হোলে ইংলণ্ডের সঙ্গে ও উপনিবেশ সকলের সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় হবে ও বৃটিস সামাজ্য বললাভ করিবে। এখন মুস্কিল এই যে শস্য মাংস ও অন্যান্য মাল উপনিবেশ হোতে খুব কম আসে। তাই বিদেশীয় মালের শুল্ক বাড়াইলেই আহারীয় দ্রব্যের দর চোড়ে যাবে। এই কথা নিয়ে কাল পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় হুলস্থুল বেধে গিয়েছিল। রাজস্ব-সচিব মিষ্টার রিচি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন যে ঔপনিবেশিক সেক্রেটারি মিষ্টার চেম্বারলেনের প্রস্তাব অত্যন্ত অসঙ্গত। সচিবে সচিবে মতভেদ বড় দেখা যায় না। উদারপক্ষের ( Liberal ) মেম্বরেরা

ভারি খুসি। গবর্ণমেণ্টকে খুব চেপে ধরেছে। আর গবর্ণমেণ্টের পক্ষের মেম্বরেরা অনেকেই চেম্বারলেনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আর এক বিপদ। যে শিক্ষাবিধি ( Education Act ) পাস হোয়েছে তাতে লোকেরা ভারি চটেছে। ইংলিশ চার্চ্চের ( Church of England ) বিরুদ্ধ সম্প্রদায়েরা (Nonconformist ) মনে করে যে এই বিধি অনুযায়ী চলিলে সব ইস্কুল ইংলিশ চার্চ্চের হাতে আসিবে। তাই তারা সহরে সহরে ধর্ম্মঘট কোরেছে যে শিক্ষার জন্য যে টেক্‌স তা কেউ দেবে না। বড় বড় লোক এই ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়েছে। যারা টেক্‌স দিচ্ছে না তাদের আসবাব পত্র সরকারে নীলাম করে টেক্‌স আদায় কর্‌ছে কিন্তু লোকে তবুও শুন্‌ছে না। বিদ্রোহ ক্রমশঃই বাড়ছে। ইংরেজ বিধির বড়ই বশ কিন্তু তারা ধর্ম্মহানির ভয়ে এবার বিধির বিরোধী হোয়েছে।

গবর্ণমেণ্টের বড়ই বিপদ।

ইংরেজ হিন্দু জাতিকে নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়েছে। জাতি শ্বেতবর্ণ না হোলেই কাফ্রি বা জুলুদের মত অসভ্য—এইরূপ এদের ধারণা ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থানে এসে তারা সে ধারণাটা হৃদয়ে পোষণ করিতে বড় সুবিধা পায় না। হিন্দুজাতি যে ইংরেজের অপেক্ষা সভ্য তার আর কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে পদে পদে এদের চোক ফুট্‌ছে কিন্তু পূর্ব্বসংস্কার ছাড়িতে চায় না। আমরা ইংরেজ বা ইয়ুরোপীয়—আমরাই সভ্য—আর সব অসভ্য—এই বুলি। ডাক্তার ফেয়ারবেয়ারণ ( Dr Fairbairn ) ও ডাক্তার ল্যাড (Dr Dadd) অমোদের দেশে দর্শন শিখাইতে গিয়েছিলেন। ভাল কথা। কিন্তু গিয়ে দেখিলেন যে হিন্দুর দর্শন তাঁদের দর্শনের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। তাই বড় একটা পসার হোলো না। এই রাগ। দাও গালাগালি হিন্দুদিগকে। ডাক্তার ফেয়ারবেয়ারণ উক্ষপারে আছেন। বেদান্তের সম্বন্ধে জানিতে এখানে অনেক অধ্যাপক

উৎসুক কিন্তু ইনি একেবারে বীতরাগ। হিন্দু দর্শনের উপর এঁর কিছু শ্রদ্ধা নাই। তবে সুখের বিষয় এই যে এখানে ইনি গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল গোছের লোক। আমাদের দেশের লোক মনে করেছিল যে কোন একটা দিগ্‌গজ এসেছে। কিন্তু উক্ষপারে এঁর প্রতিপত্তি ভারি কম। ডাক্তার ল্যাড ত স্পষ্ট লিখেছেন যে হিন্দুরা মিথ্যাবাদী ও দুশ্চরিত্র। যে ইংরেজ ভারতে যায় সেই হিন্দুর বিষয় কিছু না কিছু লেখে। এখানে এত বই বেরিয়েছে যে আমরা তার খবরই জানি না। কিন্তু প্রায় সবগুলি হিন্দুর নিন্দায় ভরা। এঁর উপায় কি। উপায় রাঙ্গা পায়। আমাদের দেশীয় ধুরন্ধরেরাও হিন্দুর নিন্দা করিতে ছাড়েন না। রমেশ বাবুর হিন্দু সভ্যতা নামক পুস্তকখানিতে হিন্দুর নামকে যে কি মাটি কোরেছেন তা বলা যায় না। তাঁর গ্রন্থের মর্ম্ম যে আমরা কোনও পুরাকালে একটু আধটু সভ্য ছিলাম—তা আবার সে সভ্যতাটুকুও ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে লোপ পেয়েছে। যাক্ তাঁর আর নিন্দা করিব না। তিনি দেশ-হিতৈষী। ইংরেজের কাছে তিনি আমাদের দারিদ্র্যের ওকালতি করেন—তাঁর মঙ্গল হোক্। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে বেদান্তদর্শন শিক্ষা হয় সেই বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। যদি হয় ত বড় ভাল হয়। কতক-গুলো বিলাতী ভুতুড়ে লোক আর বিলাতী মেয়ে মানুষের হাত থেকে হিন্দুয়ানির পাণ্ডাগিরি যত দিন না যায় তত দিন অমঙ্গল বই মঙ্গল নয়। যারা উচ্চশিক্ষিত তারা ঐ অর্দ্ধশিক্ষিত প্রেতাত্মা-মহাত্মা-গ্রস্ত উদ্ভুটে বিলাতি হিন্দুদের ঘৃণা করে। এই পাণ্ডার দল—দর্শন কি বস্তু তার বড় খোঁজ রাখে না কিন্তু কেবল নিজেদের দেশের নিন্দা ও কুৎসা করে আর না বুঝে সুঝে হিন্দুর বিষয় নিয়ে চীৎকার করে। যত স্বদেশদ্রোহী আর নব-নব-কৌতুহল-বিলাসিনী নারীগণের দ্বারা এই দল পরিপুষ্ট।

হিন্দুত্বের যে এখানে কি দুর্দ্দশা—দেখিলে বড় কষ্ট হয়। অথচ আমাদের দেশে হৈ চৈ পোড়ে গেছে যে বিলেতে হিন্দুয়ানির আদর বাড়ছে। উক্ষপার দার্শনিক সভা আমায় নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। অনেক অধ্যাপক এই সভায় আসেন। এইরকম বলিতে বলিতে যদি কিছু ফল হয়। আগামী রবিবারে ঐ সভার অধিবেশন হবে। উক্ষপার—১২ই জুন ১৯০৩।

# বিলাত ফেরত

## সন্ন্যাসীর চিঠি।

( ১০ )

মহামায়ার কৃপায় আমি দেশে ফিরে এসেছি। বেঁচে গেছি হাড় জুড়িয়েছে। কি আড়ষ্ট হোয়েই না বিলেতে থাকতে হোতো। সকাল বেলা বুট স্যুট এঁটে শয়ন-ঘর থেকে যে বেরুনো—আবার সেই শোবার সময় রাত্রিতে রাজ-সাজ খোলা। সমস্ত দিন মোজাবন্ধ কোমরবন্ধ গলাবন্ধ প্রভৃতি নানারূপ বন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত। খাবার সময় যে একটু হাঁ করে খাবো তার যো নেই। আবার যদি খেতে খেতে আওয়াজ হয়—একটু সপ্-সপ্-চপ্-চপ্-মড়-মড় বা কট্ কট্—তা হোলে নিন্দার আর সীমা থাকে না। এখামে ঘরে এসে হাঁ করে খেয়ে বাঁচ্চি। আর দধি সন্দেশের হাপ্‌রানি-ধ্বনি প্রাণটাকে আবার মধুময় কোরে তুলেছে।

দেশে এসে বিশুদ্ধ বাঙ্গালি খাওয়া খেতে বড়ই স্পৃহা হোয়েছিল। আমার ঘর দোর নাই তবে গৃহস্থ বন্ধু বান্ধবদের কৃপায় সব খেদ ঘুচে গেছে। আহা সজ্‌নে সড়সড়ি কি মিষ্টি—যেন বিরহীর পুনর্ম্মিলন সুখের আভাস পাওয়া যায়—

সজনে শাগ্ বলে আমি সকল শাগের হেলা।
আমার ডাক পড়ে কেবল টানাটানির বেলা॥

সজ্‌নে—বাস্তবিকই তুমি বিপন্নের বন্ধু। আবার লাউডগা ভাতে—কচুর শাক মোচার ঘণ্ট ও কচি আমড়ার টক খেয়ে মনে করেছি যে পারতপক্ষে

বঙ্গমাতার কোল ছেড়ে আর কোথাও যাব না। বন্ধুদের কৃপা আমড়ার টকের চেয়েও ঢের বেশী দূর গড়িয়েছে। কাঁচা গোল্লা রসগোল্লা ক্ষীর পায়েস ইত্যাদি চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়ের দ্বারা রসনা পরিতৃপ্ত করেছি। হা হতভাগ্য ইংরেজ তোমার কপালে রসগোল্লা নেই তাই ভেবে ভেবে আমার ঘুম হয় না। তুমি হিন্দু দর্শন পড়িবে স্বীকার করেছ। কিন্তু তোমার আড়ষ্ট জিভ যদি কোন দিন জামাই-তত্ত্ব রসগোল্লার রসে সাঁতার দেয়—তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে যে আর্য্যজাতি কত মহৎ এবং কত রসিক।

দুই একজন ব্রাহ্ম বন্ধু আমার বঙ্গবাসীর চিঠিতে কুরুচি আছে বলিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। কোন এক ভদ্রলোকের বাগানে একটি বকুল গাছ আছে। একটি ব্রাহ্ম প্রতিবাদ করেন যে ঐ অশ্লীল বৃক্ষটি রাখা উচিত নহে। ভদ্রলোকটি বলেন যে বকুল গাছের থাকা না থাকার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে কিন্তু ঐ বকুলে যে একটি অশ্লীল পাখী অর্থাৎ কোকিল এসে বসে তার উপায় কি। আমিও তদ্রূপ নিরুপায়। প্রণয় বিরহ বা রূপমধু-পান ইত্যাদি প্রয়োগ প্রবাসীর চিঠিতে অনিবার্য্য। যাহা হউক এখন তর্ক বিতর্ক ছেড়ে একটা আসল কথা বলি।

য়ুরোপীয়দিগের প্রায়ই এই বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হইতেছে যে শ্বেতাঙ্গ জাতি মানবকুল-শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য জাতি—গৌর শ্যাম ও কৃষ্ণ—তাহাদিগের দাসত্ব করিতে জন্মিয়াছে। এই প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা যেন একটা আসুরিক ভাব। ইহা পৃথিবীতে অনেক অমঙ্গল আনিয়াছে ও আনিবে। এই ভাব প্রবল হইলে ভারতের যে কি হানি হইবে তাহা প্রকাশ করা কঠিন। এই বিপদ কাটাইবার জন্য একটি উপায় অনেক দিন ধোরে আমার মনে হইতেছে। যদি ভারত পুরাকালের ন্যায় আবার পৃথিবীর

গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হয়—যদি ইয়ুরোপ হোতে ছাত্র সকল ভারতবর্ষে দর্শন ন্যায় স্মৃতি সাহিত্য পাঠ করিতে আসে তাহা হইলে ভারতের প্রতি পাশ্চাত্য জগতের শ্রদ্ধা হইবে ও ঐ আসুরিক ভাবের হ্রাস হইবে। ভারত যে এখনও জগতের গুরুস্থানীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে ভারতের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে তাই আজ অর্দ্ধশিক্ষিত ইংরেজ ভারত-বাসীদিগকে কাউপার ( Cowper ) ও পোপ ( Pope ) মুখস্থ করাইয়া সাহিত্য শিখাইতেছে ও মারটিনোর [ Martineau ] ব্যাখা করিয়া দর্শন শাস্ত্র উপদেশ দিতেছে। ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর বিষয় আর কি আছে। এই আত্মবিস্মৃতি কিসে যায়। আমি ভাবিলাম আমাদের শাস্ত্রবিদ্যা শিখিতে ইংরেজের যদি আগ্রহ হয় তাহা হইলে ভারতের আত্মবিস্মৃতি দূর হইবে ও ইংরেজেরও মঙ্গল হইবে। অজ্জন্য বিলাত-যাত্রা করিয়াছিলাম। গিয়া দেখি মোক্ষমূলর প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের প্রয়াসে ভারতের কিছু সম্মান বাড়িয়াছে বটে—কিন্তু সে সম্মান না হওয়া ভাল ছিল। ইংরেজের ধারণা জন্মিয়াছে যে হিন্দুজাতি এক সময়ে বড় ছিল কিন্তু এখন মরিয়া গিয়াছে। কেবল তাহার ঠাটমাত্র বজায় আছে। যেমন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মিউজিয়মে কোন একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের কঙ্কাল দেখিতে যান ও বিচার করেন যে এই জীব কতদিন বাঁচিয়াছিল—কেনই বা এখন লোপ পাইয়াছে—তদ্রূপ য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা আমাদের বিষয়ের আলোচনা করেন। আমরা এককালে বড় ছিলাম কিন্তু এখন সভ্যজগতের কাছে আমরা একটা কৌতুহলোদ্দীপক বস্তু হোয়ে দাঁড়িয়েছি। আমি এই সংস্কার দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি যে হিন্দুজাতি এখনও জীবন্ত। সহস্র সহস্র বৎসর হইয়া গিয়াছে তথাপি কালের প্রভাবে হিন্দু বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই। কত সভ্য জাতি ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে কিন্তু হিন্দুজাতি

মরণকে অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। কত উৎপাত কত শোষণ কত বিপ্লব ভারতকে বিতাড়িত ও বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। অন্য কোন দেশ ভারতের ন্যায় প্রপীড়িত ও দলিত হইয়াছে কি না সন্দেহ তবুও হিন্দু সপ্রাণ ও সতেজ। ইহার কারণ কি। বেদান্ত প্রতিপাদিত অদ্বৈতজ্ঞান হিন্দুর একমাত্র অবলম্বন ও চির সহায়। হিন্দুর যোগ-দর্শন স্মৃতি-সাহিত্য-বিধি-ব্যবস্থা আচার-ব্যবহার-সংস্কার অদ্বৈতামৃতরসে পরিপুষ্ট। অদ্বৈতমুখীন নিষ্কাম ধর্ম্মপালনে হিন্দু রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমার এইরূপ ব্যাখা শুনিয়া কামব্রজ ( Cambridge ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। হিন্দু দর্শন তথায় নিয়মিতরূপে পঠিত ও আলোচিত হয়—এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একটী কমিটি গঠিত করিয়াছেন। একজন উপযুক্ত হিন্দু পণ্ডিত প্রেরিত হইলে এই কমিটি তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহাঁকে তিন বৎসরের জন্য হিন্দুদর্শনের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করাইবেন। নয় হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করিতে হইবে। এই নয় হাজার টাকা অধ্যাপকের বেতন স্বরূপ —বার্ষিক তিন হাজার টাকা করিয়া তিন বৎসর দেওয়া হইবে। আছেন কি কোন মহাজন যে এই নয় হাজার টাকা ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত। বিলাতে হিন্দুর দ্বারা হিন্দু দর্শন অধ্যাপিত হইলে আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘুচিতে পারে ও ভারত যে সকল জাতির গুরু তাহার প্রমাণ প্রয়োগ আরম্ভ হইবে। কিন্তু যতদিন না য়ুরোপীয়েরা ভারতে হিন্দুর জ্ঞান ও ব্যবহার-শাস্ত্র শিখিতে আসে ততদিন আমার মন উঠিবে না। ভারতে এক বিশ্বজনীন সরস্বতীর পীঠস্থান কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার স্বপ্ন সদাই দেখি। স্বপ্ন যাহাতে সত্য হয় তাহার অল্প স্বল্প আয়োজনও করিতেছি। তবে তাহা বীজবপন মাত্র। ফলের কথা অনেক দূর। ইংরেজ যদি বেদান্তের অদ্বৈতবিজ্ঞান শিক্ষা করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই

তাহারা তাহাদের নিজের ধর্ম্ম ও শাস্ত্র ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে আর তাহাদের সর্ব্বনেশে আসুরিক ভাব দূর হইবে। এইরূপে তাহাদেরও মঙ্গল ও আমাদেরও মঙ্গল সাধিত হইবে। বিলাত দেখে আমার দৃঢ় ধারণা হোয়েছে যে সভ্যতা সামাজিকতা লৌকতা আচার ব্যবহার—এই সকল বিষয়ে হিন্দুজাতি ইংরেজ অপেক্ষা অনেক বড়। যে নব্য সংস্কারকেরা পাশ্চাত্য সভ্যতা দেখিয়া হিন্দুকে হীন মনে করেন তাঁহারা অত্যন্ত কৃপাপাত্র। আমাদের দেশে এক্ষণে যে অনাচার বা কুসংস্কার নাই তাহা নহে। আর ইংরেজের কাছে যে কিছু শিখিবার নাই তাহাও নহে। কিন্তু এ কথা প্রমাণ করা যায় যে হিন্দুর আন্তরিক উদারতা ও উন্নত ভাবের নিকট ইংরেজের বাহ্য রং ঢং কিছুই নয়।

আমি বারমিংহাম্ নগরে একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের বাটীতে অতিথি হোয়েছিলাম। তাঁহার পত্নী বড় বিদুষী। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া আমাদের দেশের কথা আমায় জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন। বিশেষতঃ আমাদের দেশে বিদ্যার আদর কি প্রকার তা জানিতে বড়ই ঔৎসুক্য দেখিয়েছিলেন। আমি বলিলাম যে খুব নীচজাতি ছাড়া এমন হিন্দু নাই যাহারা অল্প স্বল্প লিখিতে পড়িতে জানে না। কেন না হিন্দুর বিদ্যা-শিক্ষা ঋষি-ঋণ শোধ করিবার জন্য—নিজের গৌরবের জন্য নয়। আমাদের হাতে খড়ি দেওয়া যে একটি ধর্ম্মকার্য্য তাহা শুনিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁরা বলিলেন যে আমরা কত আইন-কানুন কোরেও এপ্রকার লেখাপড়ার প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা দাঁড় করাইতে পারি নাই। আমাদের পণ্ডিতদের উপাধি শুনিয়া তাঁরা বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর (Ocean of Learnnihg)—ন্যায়বাচস্পতি (Lord of Wisdom in Logic)—তর্করত্ন (Jewel in Disputation)

ইত্যাদি উপাধির কথা বোলেছিলাম। শেষ উপাধিটি শুনিয়া দার্শনিকের পত্নী বলিলেন—জন (দার্শনিকের ঐ নাম)—তুমি ভারি তার্কিক—তুমি তর্করত্ন উপাধিটি গ্রহণ কর। বাস্তবিক সেদিন কবে আসিবে—যেদিন য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা আমাদের কাছ থেকে উপাধি পেয়ে গৌরবান্বিত বোধ করিবেন।

ইংরেজের পারিবারিক বা সামাজিক বন্ধন একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। আমি উক্ষপারে দিন কতকের জন্য এক বাসায় ছিলাম। একটি বৃদ্ধা ও তাহার কন্যা সেই বাসাটি রেখেছে। তারা সমস্তদিন দাস্যবৃত্তি কোরে আপনাদের ভরণ পোষণ করে। কিন্তু ঐ বৃদ্ধার পুত্র একটি জাহাজের কাপ্তেন—বেস দু-পয়সা পায় কিন্তু সে নিজে ভদ্রলোকের মত থাকে ও সব টাকা খরচ করে। মা ও ভগ্নী যেমন দাসী তেমনই আছে। বেশ-বিলাসের খরচ কমাইয়া মা ও ভগ্নীকে যে কোন রকম আর্থিক সাহায্য করা উচিত সে ভাবনা কাপ্তেন বাবুর মনেই হয় না। ইংরেজ-সমাজের চক্ষে এরূপ ব্যবহার কিছু অন্যায় বোলে বোধ হয় না। এরকম ব্যাপার আকছার দেখা যায়। ছেলে গাড়ী হাঁকিয়ে যাচ্ছে আর বাপ মা দাস্যবৃত্তি কোরে জীবিকা নির্ব্বাহ কোচ্চে। বাপ মার সঙ্গে যখন এই-রূপ সম্বন্ধ তখন অপর অপর কুটুম্বদের কথা অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোকের সম্মান ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কি রকম হয় তাহা ইংরেজদের হিন্দুজাতির কাছে ভাল কোরে শেখা দরকার। কিন্তু উল্টাশ্রী দাঁড়িয়েছে। নব্য বাবু-সংস্কারকেরা বলেন যে আমাদের ঐ বিষয় ইংরেজের কাছে শেখা উচিত। ইংরেজের কাছে স্ত্রীলোকের আদর শিখিতে গিয়ে সংস্কারকেরা কি বিপদই যে ঘটাইয়াছেন তা অনেকেরই জানা আছে। স্ত্রীলোকের আদর বলিলে—ইংরেজের কাছে কেবল নিজের পত্নীর আদর বোঝায়—মা বোন ভাজ ভাইঝি বা অন্য কোন

কুটুম্বিনীর বোঝায় না। তারা মরুক বাঁচুক আর ভিক্ষা করুক তাতে আমার কি। এইরূপ শিক্ষা ইংরেজের কাছে পাওয়া যায়। ইংরেজের সভ্যতা আচার ব্যবহার ও শীলের কথা পরে আরও লিখিব।

এখন একটা কথা বোলে চিঠিটা শেষ করি। আমি এক দিনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেড্ সাহেবের (Mr. Stead) অতিথি হোয়েছিলাম। তাঁহার আপিসে একটি সভা হয় সেখানে আমি বক্তৃতা করি। মিষ্টার ষ্টেড্ আমার সঙ্গে অনেক গল্পগাছা করেন। তিনি বোল্লেন যে তাঁর একটি ডবল (Double) আছে অর্থাৎ তাঁহার শরীর হইতে হুবাহু আর একটি ষ্টেড্ সাহেব বাহির হয়। এই ডবলটি যথেচ্ছ বিচরণ করে। তিনি বোল্লেন যে একবার তাঁর কোন এক রমণী বন্ধুর জ্বর (Influenza) হয়। সেই ডবল—তাঁহাকে তিন দিন তিন রাত সেবা করে। ঐ রমণী সুস্থ হোয়ে মিষ্টার ষ্টেড্ সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে আসে। ষ্টেড্ সাহেব একেবারে অবাক্। তিনি ঐ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। এইরূপে এই ডবলটি অবাধ্য ছেলের মত যেখানে খুসী ঘুরে বেড়ায়। আমার শুনে পীলে চম্‌কে গেল। ষ্টেড্ সাহেক কি আন্‌তে একবার ঘর থেকে বাহিরে গিয়েছিলেন। তার পর যখন ঘুরে ঢুক্‌ছেন আমার ভারি আতঙ্ক হোলো। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে আপনি আস্‌ছেন না আপনার ডবল আস্‌ছেন। তিনি হেসে বোল্লেন—আমি—আমার ডবল নহি। আমি আবার ভয়ে ভয়ে বলিলাম কি করে জান্‌বো। তিনি উত্তরে বলিলেন যে আমার চুল পাকা আর আমি চুরুট খাই কিন্তু আমার ডবলের চুল পাকা নহে আর সে চুরুটও খায় না। আরও যে কত-রকম ভুতুড়ে গল্প করিলেন তাহা লিখিলে বঙ্গবাসী ভোরে যায়। আমিত সকাল বেলাই চম্পট দিলাম। আর ভূতের ভয়ে তাঁর সঙ্গে বড়

একটা দেখা শুনা করিনি আর কোন সম্পর্কও রাখিনি। তবে তিনি আমাদের দেশের বন্ধু। আসিবার সময় দেখা করে এসেছিলাম। তিনি কামব্রজের কমিটির কথা আগেই শুনেছিলেন। অত্যন্ত আহ্লাদ ও উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। ইতি তারিখ ৭ই সেপ্টেম্বর-

কলিকাতা।

সমাপ্ত।

কলিকাতা ১৯৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীবিহারীলাল মোহান্ত দ্বারা মুদ্রিত।